বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

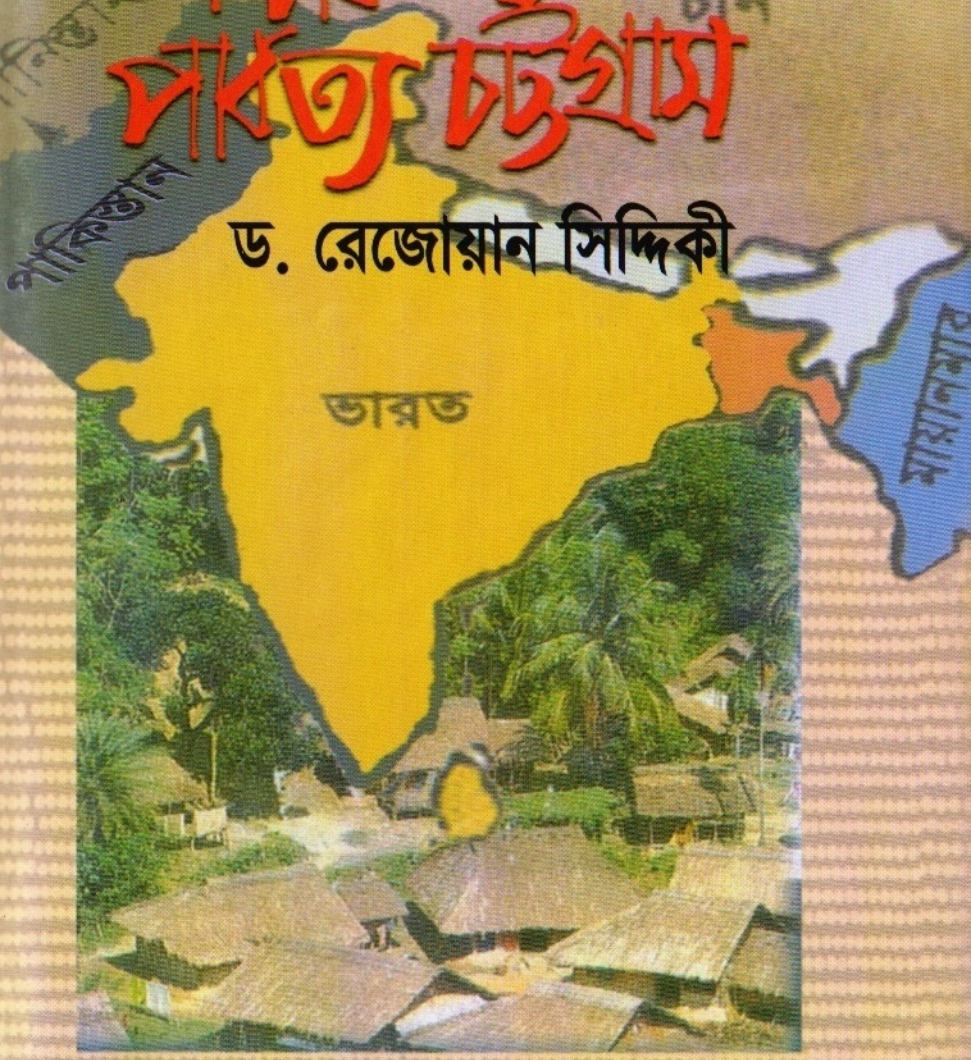

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী'র জন্ম টাঙ্গাইল জেলার এলাসিন গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, ১৯৫৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। পিতা আতিকুল হোসেন সিদ্দিকী, মাতা হাওয়া সিদ্দিকী উভয়েই জান্নাতবাসী। এলাসিন তারক যোগেন্দ্র হাইস্কুল থেকে এস. এস. সি. পাস করে ১৯৬৮ সালে ভর্তি হন করটিয়া সা'দত কলেজে। জড়িয়ে পড়েন বাম ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে। '৬৯-এর সামরিক শাসনের পর মাথায় হুলিয়া নিয়ে আত্মগোপন করেন। ১৯৭০ সালে আবার ভর্তি হন ঢাকা'র জগন্নাথ কলেজে। এইচ. এস. সি. পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (১৯৭৬) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এমফিল-এ ভর্তি হন, পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯৫ সালে। এর মধ্যে ১৯৯০-'৯১ সালে হল্যান্ডের হেগ নগরীর ইনস্টিটিউট অব সোশাল স্টাডিজ থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

জীবনের লড়াই শুরু করেছিলেন সেই ১৯৭০ সাল থেকেই। সংবাদপত্রের সকল বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৭২ সালে যোগ দিয়েছিলেন দৈনিক বাংলায়। কাজ করেছেন ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত। '৯৪-'৯৬ ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব। ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত *দৈনিক দিনকাল*-এ বার্তা সম্পাদক ছিলেন। ২০০২ সালে যোগ দেন লন্ডন থেকে প্রকাশিত *দৈনিক বাংলাদেশ* পত্রিকার বাংলাদেশস্থ আবাসিক সম্পাদক হিসেবে। ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী লিখে গেছেন অবিরাম। সংবাদপত্রে কলম ধরেছিলেন ১৯৭২ সালের শুরু থেকে। সে কলম কখনও থামে নি। ছোটগল্প লিখেছেন দু'শতাধিক, উপন্যাস ন'টি, প্রত্যেকটি ব্যতিক্রম। লিখেছেন ফিকশন, রাসপুটিনের জীবনী, অনুবাদ, নাটক, প্রবন্ধ আর সমালোচনায় আছেন অগ্রণী, খবরের কাগজের কলাম তো আছেই। টেলিভিশনের উপস্থাপক, সাংবাদিকতা ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। ছুটে বেড়ান দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। তার সাড়া জাগানো গবেষণা *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, *কথামালার রাজনীতি (১৯৭২-'৭৯)*, *Cultural Colonization : India Bangladesh Issue*, *গণতান্ত্রিক পরিবেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতি* প্রভৃতি।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে লড়াই করে যাচ্ছেন ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী। সরকারী রোষে জেল খেটেছেন, হয়রানি, হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। কিন্তু নত হতে শেখেননি রেজোয়ান সিদ্দিকী।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ও
পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রকাশক ■ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক, বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১১৩৮৭১, ৮১১০৬৮০

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম
ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী
স্বত্ব ■ লেখক
প্রথম প্রকাশ ■ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রচ্ছদ ■ মোমিনউদ্দীন খালেদ
কম্পোজ ■ আইডিয়াল কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০
মুদ্রণ ■ সালমানী প্রিন্টিং প্রেস নয়াবাজার ঢাকা

BANGLADESH BHARAT SOMPARKA O PARBATTA CHATTAGRAM
By Dr. Rezwan Siddiqui

Published by Saeed Bari, Chief Executive, Sucheepatra
38/2Ka, Banglabazar Dhaka 1100
Ph : (880-2) 7113871, 8110680
E-mail : omi @ bangla. net
price : Tk. 100.00 Only, Us $ 5.00

মূল্য ◆ ৳ ১০০.০০ মাত্র

ISBN 984-810-244-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ওয়াসিমুল বারী রাজিব

বন্ধুবরেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

এই বইয়ের সকল লেখার রচনাকাল ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে। লেখাগুলি ছাপা হয়েছিল *দৈনিক দিনকাল, সাপ্তাহিক অগ্রযাত্রা, সাপ্তাহিক জনতার ডাক*-সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

লেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাকে কিছুটা অমনোযোগীই বলা যায়। সেটা সময়ের অভাবের কারণে। ফলে প্রত্যেকটি লেখার নিচে সঠিক দিন-তারিখ উল্লেখ করা গেল না।

গ্রন্থের লেখাগুলোতে যে মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তা ঐ সময়ের সাধারণ মানুষের মনোভাবেরই প্রতিফলন বলে আমি দাবি করতে চাই। একজন সাংবাদিক হিসাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগের ফলে তাদের মনোভাব জানা সহজতর হয়েছে।

১৯৯৬-২০০১ কাল পরিসরে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তিগুলো যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক চুক্তির অনুকূল ছিল না; বরং সেগুলো ভারতের স্বার্থের অনুকূল ছিল, সে বিষয়টি লেখাগুলোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে লেখাগুলোর বিশেষ কোন পরিমার্জন করা হয়নি। কারণ ঐসব বিষয় নিয়ে একজন কলম-সৈনিক হিসেবে আমার নিজের এবং জনগণের মনোভাব কি ছিল, তা অবিকল রাখতে চেয়েছি।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে ১৯৭৭ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকালে সম্পাদিত গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি এবং শেখ হাসিনার শাসনকালে ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত পানি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ। আর আছে পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণ। এগুলো ভবিষ্যতে পাঠক-গবেষকদের প্রয়োজন মেটাবে বলে আশা করছি।

এই লেখাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে *সূচীপত্র*-র প্রধান নির্বাহী সাঈদ বারীর নিরন্তর তাগিদের ফলে। তার কল্যাণ হোক।

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

১১ রামের খড়ম, দেব গৌড়ের ছবি এ হাসিনা-বসু আলোচনা
১৩ পার্বত্য এলাকায় মাদক চোরাচালানে মদদ দিচ্ছে কে?
১৬ কমলগঞ্জেও গ্যাস ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড :
বাংলাদেশ বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র নয় তো?
১৯ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা একটি আত্মঘাতী সন্ধি
২২ শেখ হাসিনার নিঠুর খেলা
২৫ বাংলাদেশকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানোর পাঁয়তারা
২৮ ভারতভুক্ত জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি
নৈতিক সমর্থন দেয়া যাবে না কেন?
৩১ অপমানে হতে হবে সবার সমান
৩৪ ধিক্, এই সংকীর্ণ মানসিকতা
৩৮ হাসিনা সরকার সার্ক অকেজো করতে চাইছে?
৪২ রং ট্র্যাকে হিল ট্র্যাক্টস
৪৫ শান্তিবাহিনী নরহত্যা করেই যাচ্ছে
সরকার নীরব কেন?
৪৮ ফটিকের এক বাঁও মেলেনি : দো বাঁও মেলে-এ-এ-নি
৫০ ভারতের দাদাগিরি
৫২ ভারত কি বাংলাদেশকে তার নিজ ভূখণ্ড ভাবতে শুরু করেছে?
৫৫ পরাধীনতার দিকে
৫৮ হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকের বসতি স্থাপন : বেহাত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম
৬১ নিলামে বাংলাদেশ
৬৪ শান্তিবাহিনীর শর্তে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার
৬৬ সরকার হটিয়ে হলেও রাখতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম
৭০ আন্তর্জাতিক মিথ্যাচারিতার নিকৃষ্ট নমুনা
৭৩ বাংলাদেশ কি আমাদের নয়? শাহজাহান জানতে চাইলেন
৭৫ 'মেঘলা' হ্রদ যেন পার্বত্যাঞ্চলের লাখো মানুষের অশ্রুর সঞ্চয়
৭৭ প্রতিবাদের ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল : চুক্তি মানি না
৮০ অনগ্রসর বাঙালির জরাজীবন : আনসার পোস্টে সাদা পতাকা
৮২ শত মাইল পথে ঘরে ঘরে কালো পতাকা : ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর
৮৪ পুলিশী বালির বাঁধ দিয়ে কি জনতার জোয়ার রোধ করা যাবে?
৮৭ আমার স্বদেশের চেয়ে বড় কিছু নাই প্রিয় কেহ নাই

পরিশিষ্ট

৯০ ফারাক্কা চুক্তি ১৯৭৭
৯৩ পানি বণ্টন চুক্তি (১৯৯৬) : পূর্ণ বিবরণ
৯৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি : পূর্ণ বিবরণ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রামের খড়ম, দেব গৌড়ের ছবি এবং হাসিনা-বসু আলোচনা

রামায়ণের কাহিনীতে আছে, রাম যখন বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন তার ছোট ভাই ভরত রামের হয়ে অযোধ্যার শাসন কাজ পরিচালনা করেন। কিন্তু রামের সিংহাসনে বসে তিনি কোনোদিন শাসনকার্য পরিচালনা করেননি। বরং সিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠান করেছিলেন রামের প্রতীক হিসেবে রামের খড়মকে। খড়ম আসীন হয়েছিল অযোধ্যার সিংহাসনে।

এখন সে রামও নেই, আর সে অযোধ্যাও নেই। কিন্তু তার সঙ্গে একটি সাযুজ্যময় চিত্র দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দফতরে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৩০ নভেম্বর এক বৈঠকে বসেছিলেন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মি. জ্যোতি বসুর সঙ্গে। এসব বৈঠকের সময় শেখ হাসিনা সাধারণত ১৯৭৫ সালে একদলীয় বাকশাল সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পিতা প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দৃশ্যমান করে রাখেন। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসীন হবার পর প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এমন কোনো ছবি রিলিজ করা হয়নি, যাতে প্রয়াত শেখ মুজিবের ছবি দৃশ্যমান নয়। কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটেছে জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলাপরত শেখ হাসিনার ছবিতে।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মি. জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনাকালে দেখা গেল ভিন্ন ছবি। সে ছবি রাখা ছিল জ্যোতি বসু ও শেখ হাসিনার মাঝখানের টেবিলে। সযত্নে সোনালি ফ্রেমে বাঁধাই করা মূল্যবান ছবি। সে ছবি হল রোম খাদ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মি. দেব গৌড় ও শেখ হাসিনার পাশাপাশি বসে আলোচনার ছবি। জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনার সময় ওই ছবি টেবিলে সাজিয়ে রাখার নিশ্চয়ই কোনো মাজেজা রয়েছে। এ মাজেজা কী? এটা কি জ্যোতি বসুকে জানান দেয়া যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মি. দেব গৌড়েরসঙ্গে শেখ হাসিনার সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল? না কি ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়কে তিনি কতটা শ্রদ্ধা করেন সে কথা জানিয়ে দেয়া? মি. বসু বলেছেন, তিনি ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে মি. দেব গৌড়ের সঙ্গে কথা বলবেন। ওই ছবি রাখার উদ্দেশ্য কি এই যে, জ্যোতি বসু যেন গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাকে এতটাই শ্রদ্ধা করেন যে, তিনি সব সময় দেব গৌড়ের সঙ্গে তার আলোচনার বাঁধানো ছবিটি চোখের সামনে রাখেন? না কি এও রামের খড়ম? দেব গৌড় নেই। কিন্তু তার ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটি তো আছে!

পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে বাংলাদেশ সরকার যে আত্মসম্মান বিবর্জিত হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে সকল মহলে। ভাটির

www.pathagar.com

দেশ হিসেবে পানি যে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সম্ভবত সে কথা ভুলেই গেছেন। আর সে কারণে এমন ভিখারী কাতরতা নিয়ে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ করজোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, যা বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

শুধু তাই নয় মি. বসুর বাংলাদেশ সফরকালে তার সফরসঙ্গী হিসেবে থেকে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশবাসীকে যে অমর্যাদাকর অবস্থানে নিয়ে গেছেন, তার সমালোচনা হচ্ছে বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে। শুধু বাংলাদেশেই নয়। ছি ছি পড়েছে কলকাতায়ও। কলকাতার *আনন্দবাজার* পত্রিকা ২৯ নভেম্বর '৯৬ তার শীর্ষ সংবাদে লিখেছে "জ্যোতি বসুর রিকশা সওয়ার হওয়ার ছবি যতটা দুর্লভ, সামাদ সাহেবের সর্বক্ষণ তাঁর ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকার ঘটনাও বোধ হয় তার চেয়ে কম কিছু দুর্লভ নয়। ভারতের কোনো অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সফরে এলে বিদেশমন্ত্রীকে সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গী হতে হবে প্রোটোকল বুকে ধরেই নেয়া যায় সে কথা লেখা নেই। ... কিন্তু পানি প্রার্থী হাসিনা সরকারের যে মস্ত দায় তাতে কেতাবি প্রোটোকলের ধার ধারলে আর যাই হোক সামাদ সাহেবের চলে না। মেহমানের মেহমান জ্যোতি বাবু যত্ন-আত্তির ব্যবস্থায় যাতে পান থেকে চুনও না খসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাকে তা দেখার গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। আর সেই গুরুদায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে যে কোনো অবিশ্বাস্য বিন্দু পর্যন্ত পৌছানো যায়, আশ্রমের মধ্যে ব-কলমে আওয়ামী লীগ আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রীর নাগরিক সংবর্ধনার শেষে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দেখলাম তারও প্রমাণ দিলেন।"

আনন্দবাজার আরো লিখেছে "সংবর্ধনা সভায় যে ভাষায় জ্যোতি বাবুর স্তুতি বন্দনা হল নির্বাচনের মুখে সাতগাছিয়াতেও (জ্যোতি বসুর নির্বাচনী এলাকা) সিপিএম-এর প্রচারকেরা বোধ হয় সে সব কথা বলার সাহস পাবেন না।"

আনন্দবাজার একজন নাগরিকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে "মানুষের তো চক্ষুলজ্জা বলেও একটা ব্যাপার থাকে গিয়া।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারত-প্রীতিতে আওয়ামী লীগ সরকারের চক্ষুলজ্জা বলেও কি কিছু নেই?

www.pathagar.com

পার্বত্য এলাকায় মাদক চোরাচালানে মদদ দিচ্ছে কে?

সংবিধান ও দেশের অখণ্ডতা বিরোধী পার্বত্য কালো চুক্তি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি নতুন কথা বলতে শুরু করেছেন। একথা তিনি জাতীয় সংসদে যেমন বলেছেন, তেমনি মাঠে-ঘাটের বক্তৃতায়ও বলতে শুরু করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে বিনেপির কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে শাসক দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায় না। তারা জনগণকে ভুল পথে পরিচালনার মাধ্যমে একটি ইস্যু সৃষ্টি করতে চায়। তারা (বিএনপি) সেখানে যুদ্ধের মত একটি পরিস্থিতি চায়, কেন না সেখানে বিশৃঙ্খলা থাকলে সেখান থেকে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানীদের কাছ থেকে তারা ফায়দা লুটতে সক্ষম হবে।

মাদক চোরাচালান এমনই একটা ইস্যু যা দেশে তো খায়ই, বিদেশে আরও ভাল খায়। প্রধানমন্ত্রী বারবার এরকম বক্তব্য দিতে থাকলে তা বিদেশীদেরও চোখে পড়বে এবং একথা যদি বিদেশীদের বিশ্বাস করানো যায় গোয়েবলসীয় কায়দায়, তাহলে শাসক দল নেত্রীর মনোবাঞ্ছা অনেকখানি পূরণ হবে—এই বোধ করি আশা।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দেবার জন্য শাসক দলের নেত্রী যে প্রণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছেন বর্তমান ধুয়াও তার মধ্যে একটি। এই সরকারের মিথ্যাচারিতা সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল আছেন, তারা জানেন সত্য ভাষণ এদের ধাতে নেই। অবিরাম মিথ্যা ভাষণে এরা অক্লান্ত। সে মিথ্যার বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক প্রমাণ উপস্থিত করা হলেও তারা তাদের মিথ্যাচার অব্যাহত রাখেন। এসব মিথ্যার সাফাই গাওয়ারও অনেক উচ্ছিষ্টভোগী আছে সমাজে। তারা আবার ডুগডুগি বাজিয়ে খবরের কাগজে সেই মিথ্যাচারের সপক্ষে লিখে যাচ্ছেন অবিরাম। বিএনপির কোন খবরের কাগজ নেই বলে এর প্রতিবাদও সোচ্চার হয়ে ওঠে না। জনগণ একতরফা মিথ্যাচার ও তার সাফাই-ই কেবল জানতে পারেন, প্রকৃত সত্য নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এই অবিরাম অপপ্রচারণায় যে জনমনে কোনই প্রভাব ফেলে না, সে কথাও বলা যায় না। সাময়িকভাবে হলেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিতে গত সপ্তাহে পার্বত্য এলাকায় গণহত্যার নায়ক, ভারতের তাঁবেদার এবং সম্প্রতি শাসক দলের অতি প্রিয়জন সন্তু লারমাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সন্তু লারমার স্ট্যাটাস কোন এমপি'র সমান তো নয়ই, কোন ইউপি চেয়ারম্যানের সমানও নয়। তা হলে এই সন্তু লারমাকে সরকার কোন্ বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে জামাই আদরে রেখে পুলিশ-

www.pathagar.com

বিডিআর-আনসারের পাহারা দিয়ে রাখেন? রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে থাকবার কথা তো বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানদের। বাংলাদেশেরই একজন নাগরিককে সরকার কেন বিদেশী রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে রাখছেন—জনমনে সে প্রশ্নও দেখা দিয়েছে।

তবে কি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছে? সন্তু লারমাকে দিয়েছে ভিন্ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা? দিয়েছে যে, তা গত বছর তথাকথিত শান্তি আলোচনা শুরুর পর থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। তখন থেকেই সন্তু লারমাকে ভারত থেকে হেলিকপ্টারে করে এনে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে রাখা হয়। তার সঙ্গে সেখানেই আলোচনা হয়। তার নিরাপত্তার আয়োজন করা হয় ভিন্ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মতই। সরকার এখনও পর্যন্ত এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি।

পার্বত্য কালো চুক্তির পক্ষে সরকারের সাফাই হল : এই চুক্তির ফলে ওই এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিএনপি শান্তি চায় না বলেই ওই চুক্তির বিরোধিতা করছে। কিন্তু সরকার কখনও যেসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না সেগুলো হল : (১) এই চুক্তি দেশের এককত্ব বিরোধী (২) এই চুক্তির বলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। কেন না বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকার পার্বত্য পরিষদের অনুমতি ছাড়া সেখানে কোন রকম স্থাপনাও নির্মাণ করতে পারবে না। (৩) পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতা পরিচালনা করবে পার্বত্য পরিষদ। অর্থাৎ সেনাবাহিনী আমাদের, কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ পার্বত্য পরিষদের হাতে থাকবে। যেন সেনাবাহিনী হবে বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর মত। অথবা ভাড়াটে বাহিনীর মত। পার্বত্য পরিষদই তাদের ব্যবহার করতে পারবে, বাংলাদেশের সরকার পারবে না। (৪) পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাষীরা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কারণ তারা ওই এলাকার বাসিন্দা কি না, তা নির্ধারণের ভার দেয়া হয়েছে উপজাতীয়দের হাতে। (৫) বাংলাদেশের বাংলাভাষাভাষী নাগরিকরা পার্বত্য এলাকায় কোন জমি কিনতে পারবে না বা বসতি স্থাপন করতে পারবে না। (৬) সেখানকার পুলিশ বাহিনীর চাকরি পাবে শুধুমাত্র উপজাতীয়রা—এটাও সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। (৭) পার্বত্য পরিষদ বিদেশের সঙ্গে যে কোন চুক্তি করতে পারবে। (৮) পার্বত্য পরিষদের ওপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব থাকবে না ঠিকই, কিন্তু পার্বত্য পরিষদের মনোনীত ব্যক্তিকে সরকারের মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করতে হবে।

এই বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে পার্বত্য অঞ্চলের ওপর বাংলাদেশের কর্তৃত্ব খর্ব করেছে। কিন্তু এসব বিষয়ের দিকে না গিয়ে শাসক দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বরাবরই এই চুক্তি নিয়ে উল্টো-পাল্টা কথাই বলেছেন, তার অংশ হিসেবেই সম্প্রতি দেশবিরোধী পার্বত্য চুক্তিকে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত করে বিরোধী দলের ওপর এক হাত নেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এটিও তার চরম অসত্য বক্তব্যই।

সেখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছুকাল আগে বিডিআর-এর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিডিআর পার্বত্য এলাকায়

www.pathagar.com

কয়েক শ' একর জমির আফিম নষ্ট করে দিয়েছে। তারা জানায়, আরও সহস্রাধিক একর জমিতে আফিমের চাষ হয়েছে বলে তারা খবর পেয়েছেন। এবং সে আফিম ক্ষেত ধ্বংস করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছেন।

বিডিআর পরিবেশিত এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর সেখানে আফিমসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্যের চাষ পুরোদমে শুরু হয়েছে। আর সে চাষ যে বাঙালিরা করছে না সে কথাও স্পষ্ট। অর্থাৎ তথাকথিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা পুরোদমে মাদকের চাষ শুরু করেছে। এখন সেনাবাহিনী-বিডিআর-এর ভয় নেই বলেই তারা এ কাজ করতে সাহস পাচ্ছে। বিডিআর-এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, উপজাতীয় সন্ত্রাসী ও ড্রাগ লর্ডরা মাদক দ্রব্যের চাষ করছে জানলেও সেটা তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙে দেয়ার ক্ষমতা বিডিআর-এর নেই। এ জন্য তাদের অনুমতি চেয়ে অপেক্ষা করতে হয়। সে অনুমতি কি সন্তু লারমা দেবে? দিলে বিডিআরকে অপেক্ষা করতে হবে কেন? তবে কি মাদকের গাছগুলো কেটে নেয়ার পর অনুমতি দেয়া হবে? তা হলে মাদক দ্রব্য চাষ ও চোরাচালানে উৎসাহ দিচ্ছে কারা-সরকার না কি বিএনপি? প্রধানমন্ত্রী একথার সুস্পষ্ট জবাব দিলে ভাল করবেন।

www.pathagar.com

কমলগঞ্জেও গ্যাস ক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড : বাংলাদেশ বিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র নয় তো?

বাংলাদেশ প্রধান ও অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে কি কারও নজর পড়েছে? কেউ কি আমাদের এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে দেবার চক্রান্ত করছে? তা না হলে কমলগঞ্জের গ্যাস ফিল্ডে ১৬ জুন আগুন লাগল কেমন করে। সে আগুন এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্তও দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এই আগুনে পুড়ে গেছে কোটি কোটি টাকার গ্যাস সম্পদ। সরকারি তরফ থেকে প্রথাগত বক্তব্য দেয়া হয়েছে—তদন্ত চলছে।

এদিকে যে সরকার দশ দিকে শুধু নাশকতাই দেখতে পায়, সে সরকার এবারে কোন নাশকতা দেখতে পেল না। তাদের কি তবে নাশকতার রোগ সেরে গেছে? না কি কমলগঞ্জের গ্যাস ক্ষেত্রে সত্যি নাশকতামূলক কিছু ঘটেছে বলেই সবকিছু চুপচাপ। শুনশান। পাবনার গ্রামে আওয়ামী চোরেরা চুরি করেছিল বিদ্যুৎ টাওয়ারের নাটবল্টু। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং বলেছিলেন, ওই ঘটনা ছিল নাশকতামূলক। আর সে নাশকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না কি ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, জড়িত না কি ছিলেন বিএনপির আবদুল মান্নান এমপি, জড়িত না কি ছিলেন ঢাকার সাবেক মেয়র মির্জা আব্বাস আর যুবদল সাধারণ সম্পাদক গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। সে জন্য তাদের গ্রেফতারও করা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, যেন প্রফেসর ড. খোন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং অভিযুক্ত অন্যরা নিজ হাতে রেঞ্জ নিয়ে ওই সব নাট-বল্টু খুলেছিলেন।

এমন পরিস্থিতিতে সিলেটের কমলগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। সরকারের ঢাক বাদক দু' একটি পত্রিকা আবার বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য আগাম বলেছে, হরিপুরের গ্যাস ফিল্ডে চার বছর ধরে আগুন জ্বলেছে। যেন ঘটনাটি খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু ঘটনাটি যে স্বাভাবিক নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে। এসব রিপোর্ট থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ঘটনাটি খুব স্বাভাবিক নয়। এই গ্যাস ফিল্ডে যে বিস্ফোরণ ঘটবে, কিংবা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই জানতেন। আর জানতেন বলেই তারা শ্রীমঙ্গল থেকে ১২০০ ব্যাগ সিমেন্ট নিয়ে এসে মজুত করেছিলেন গ্যাস ফিল্ডে। প্রায় আড়াই শ' কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল গ্যাস ফিল্ড থেকে। তেমনিভাবে কমলগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে বিস্ফোরণের ঠিক আগে আগে এসেছিল একটি

www.pathagar.com

রহস্যজনক হেলিকপ্টার। সে হেলিকপ্টার এসেই চলে গিয়েছিল। তার পরপরই ঘটেছিল কমলগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের বিস্ফোরণ। এ দু'য়ের সঙ্গে কি কোনই সংযোগ নেই।

হ্যাঁ, আমরা আশংকা করি, এই ঘটনার পেছনে ষড়যন্ত্র থাকা অস্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারত নানা ধরনের অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে। তারা বাংলাদেশের উপকূলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে বাধা দিয়েছে। ফলে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজ পরিত্যাগ করা হয়েছিল উপকূলে। স্বাধীনতার পরপরই সীমান্ত এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল চুনাপাথরের খনি। সে খনি বন্ধ করা হয়েছিল ভারতীয় ষড়যন্ত্রেই। অনেকেই মনে করেন, হরিপুরের তেল ক্ষেত্র বন্ধ হয়েছে ভারতীয় চাপেই। আমরা ঘরপোড়া গরু বলেই কমলগঞ্জের গ্যাস ফিল্ডের অগ্নিকাণ্ডের পেছনে আমরা সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাই। এই গ্যাস কূপ খননের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি অক্সিডেন্টালকে। অক্সিডেন্টালই বা কেন এই গ্যাস কূপ খননের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সাজ-সরঞ্জাম আগেই আনেনি। তারা কি জানত না যে, গ্যাস ফিল্ডে এ ধরনের কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে? এর আগে একটি তেল কূপ খননের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল বিশ্বখ্যাত শেল কোম্পানিকে। সে শেল কোম্পানি আসামের তেল কূপের স্বার্থে বাংলাদেশের তেল কূপ সীল করে দিয়ে বলেছিল, এখানে যে সামান্য তেল আছে, তার উত্তোলন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়। পরে দেখা গেল, ভারতের আসামের তেল কূপ খননের দায়িত্ব পেয়েছে শেল ও তার অংশীদাররা। আর তারা বাংলাদেশের ওই তেল কূপ এমনভাবে সীল করে দিয়েছিল যে ওই এলাকায় আর আমাদের পক্ষে তেল কূপ খনন করা সম্ভব ছিল না।

অক্সিডেন্টাল কমলগঞ্জ গ্যাস কূপ খননের ব্যাপারে কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় আমাদের মনে তেমন আশঙ্কাই পুনরায় জাগরিত হয়। অক্সিডেন্টাল-এর সঙ্গে অন্য কোন দেশের লবিস্টদের কোন যোগসাজশ নেই তো?

গ্যাস এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। এই গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল আমাদের সার কারখানা, এই গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন, তরলীকৃত গ্যাসে যানবাহন চালানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে প্রকল্প ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশের গ্যাস নিয়ে যে কোন রকম ষড়যন্ত্র নতুন করে হচ্ছে না, সে কথা বলা যায় না, পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, কমলগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের অগ্নিকান্ডে পুড়ে গেছে এক ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। তা ছাড়া এই গ্যাস ফিল্ডের নিচে আছে অকটেন, ডিজেল, পেট্রোলের মত বিপুল পরিমাণ মূল্যবান জ্বালানি। কেউ কি তবে এই মূল্যবান সম্পদ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করছে?

এ নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পেছনে যেসব কারণ রয়েছে, সেগুলো হল ১. অক্সিডেন্টাল কেন এই গ্যাস ফিল্ডে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ মজুত রাখেনি? ২. তারা যখন আগে থেকেই টের পেয়েছিল

www.pathagar.com

এই গ্যাস ফিল্ডে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, তখন তারা বিমান চার্টার করে সিঙ্গাপুর থেকে তাদের বিশেষজ্ঞ আনল না কেন? ৩. কেন তারা ফ্যাক্স-ফোনে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করল না। ৪. যে হেলিকপ্টারটি বিস্ফোরণের ঠিক আগে আগে কমলগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল, সে হেলিকপ্টারটি কাদের? হেলিকপ্টারটি ওই এলাকায় কেন এসেছিল? কেন সরকার এ সম্পর্কে এখনও নীরব আছেন? নাকি আবারও ২০ দিন পর সরকার এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবেন।

আমরা বলতে চাই, এ বিষয়ের ওপর তদন্ত করা হোক। সে তদন্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। এ নিয়ে কোন রকম ঢাকঢাক গুঁড়গুঁড় যেন না ঘটে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যে কোন মূল্যে গ্যাসসহ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সামনে।

www.pathagar.com

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা একটি আত্মঘাতী সন্ধি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেব গৌড়া ৬ জানুয়ারি '৯৭ বাংলাদেশে এলেন, কথা বললেন এবং জয় করে নিয়ে চলে গেলেন ৭ জানুয়ারি। মাত্র ৩০ ঘণ্টার সফরে এত বড় সাফল্য আধুনিক পৃথিবীর কোন সরকার প্রধান অর্জন কররেত পেরেছেন বলে শোনা যায়নি।

কী না নিয়ে গেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া, কী না পেলেন তিনি ভারতের অনুকূলে। এর আগে গতমাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়াদিল্লী সফরকালে কী না রেখে দিয়েছেন দেব গৌড়া। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির নামে তিনি খরা মওসুমে কলকাতা বন্দরের জন্য অধিক পানি নিশ্চিত করেছেন। তিরিশ বছর মেয়াদী চুক্তির আড়ালে আসলে সম্পাদন করেছেন ঋতুমেয়াদী চুক্তি, সে চুক্তিও বাস্তবায়নে বিরোধ দেখা দিলে বাংলাদেশ কোন তৃতীয় পক্ষের কাছে যেতে পারবে না সালিশের জন্য, কোন অবস্থাতেই না। বরং পানি নিয়ে ভারত যা করবে বাংলাদেশকে তা মেনে নিতে হবে অবনত মস্তকে। পানির প্রতি বাংলাদেশের অধিকার অস্বীকার করে তাকে কেবল দয়ার দানে পরিণত করতে পেরেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমান দেব গৌড়া।

ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি নিয়ে অনেক কথাই হয়েছে, অনেকেই কী মজা কী মজা বলে ধেই ধেই নৃত্য করেছেন, কিন্তু চুক্তির বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা বলেছেন, এবার বাংলাদেশ হবে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ল্যান্ড ব্রিজ। পানি চুক্তির মধ্যস্থতাকারী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পানি চুক্তিতে লাভবান হয়েছে ভারত, এবার তারা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে পারবেন। ভারতের এই উল্লাসের মধ্যে তবলায় তাল তুলেছেন আমাদের কিছু আত্মসম্মান বিবর্জিত, হীনম্মন্যতার এইডসে সংক্রমিত কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। কিন্তু ক্রমেই যখন থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ল, যখন এদের পর্বতপ্রমাণ মূর্খতা খবরের কাগজের পাঠকদের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়ল, তখন তারা পানি-জল বাদ দিয়ে আবার বিএনপিকে হেদায়েত করতে শুরু করল। কী নির্লজ্জ বেহায়াপনা। এই তাঁবেদারদের স্তাবকতায় অন্তর্যামীর মতো সম্ভবত হেসেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মি. দেব গৌড়া।

কিন্তু ঢাকায় এসে, শ্রী দেব গৌড়া তেমনি আর এক বিরাট বিজয় অর্জন করে নিলেন। মনে হলো প্রধানমন্ত্রী শেষ হাসিনার সরকার তাঁকে যা দিলেন, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ। এ সময় যেসব বিষয় ভারত অর্জন করল, তা হল—১. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন সক্রিয় করে তোলা, ২.

www.pathagar.com

অল্প সময়ের মধ্যে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠকের ব্যবস্থা করা, ৩. সীমান্ত এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্মূলসহ এ ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে আলোচনার জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, ৪. যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের মাধ্যমে ট্রানজিট প্রদান, এবং সর্বোপরি ৫. বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা। আর কিছু সম্ভবত চাওয়ারও ছিল না ভারতের প্রধানমন্ত্রীর, দেয়ারও ছিল না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর। এখন এক এক করে বিষয়গুলো আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, যৌথ নদী কমিশন সক্রিয় করে তোলা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যৌথ নদী কমিশন সক্রিয় করে তুললে বাংলাদেশের মানুষ না জানি কত লাভবান হবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষ গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন নিয়ে দেড় শতাধিক বৈঠককালে বারবার একথা শুনেছে। ফলে তাদের মনে ভুয়া আশার সঞ্চার করা যাবে—একথা মনে রেখেই হয়ত এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু গঙ্গার পানি বণ্টনের হেয় চুক্তি স্বাক্ষরের পর জেআরসি-কেআরসি'র যে আর কোন অর্থই নেই, সে কথা কে কাকে বোঝায়।

দ্বিতীয়ত অল্প সময়ের মধ্যে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক ডাকা। জেআরসি'র ক্ষেত্রে অল্প সময়ের দরকার নেই। সে কথা উল্লেখও করা হয়নি ঘোষণায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের বৈঠক ডাকার কারণ কি? এ ব্যাপারে এত তড়িঘড়ি কেন? কারণ আছে। আর সে কারণই হল ট্রানজিট।

বিএনপি'র চাপে ভারতকে সরাসরি ট্রানজিট না দিয়ে এখন অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের নামে 'অল্প সময়ের মধ্যে' ট্রানজিট দিতে হবে। দেব গৌড়ার সাথে সে ধরনের সমঝোতাই করেছেন শেখ হাসিনা। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির বিশদ বিবরণ যেমন শেখ হাসিনা দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করেননি, গোপন রেখেছেন। তেমনি অর্থনৈতিক কমিশনের মাধ্যমে যে ট্রানজিট দেবার পাঁয়তারা করছেন, সে কথাও তারা গোপন রাখলেন জনগণের কাছ থেকে। কিন্তু কোন গোপনই যে শেষ পর্যন্ত গোপন থাকে না আওয়ামী লীগ সরকার সম্ভবত সে কথা ভুলেই গেছেন।

চতুর্থ বিষয়টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। তা হল—দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতিকে বাদ দিয়ে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সমিতি গঠন। আর সে সহযোগিতায় থাকবে না ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান, থাকবে না মালদ্বীপ, থাকবে না এমনকি শ্রীলঙ্কাও। নতুন করে ভারতের সঙ্গে থাকবে শুধু বাংলাদেশ।

ভারত নিয়ন্ত্রণ করে ভুটানের পররাষ্ট্রনীতি ও বাণিজ্য। ভারত নিয়ন্ত্রণ করে নেপালের অর্থনীতি ও রাজনীতি। তা নিয়ে নেপালেও প্রতিবাদ আছে, আন্দোলন আছে। কিন্তু শক্তি খাটিয়ে ভারত নেপালকে তাঁবে রাখে। ভারতের পুলিশ গিয়ে হানা দেয় নেপালের নাগরিকদের বাসভবনে। ভারত বাধ্য করে নেপালের চীনের সঙ্গে চুক্তি রদ করতে। ভারতীয় মুদ্রায় নেপালের হাট-বাজারে কেনা-বেচা চলে।

ভারতীয় নাগরিকদের নেপালে যেতে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পাসপোর্ট লাগে না। একথা সত্য ভুটানের ক্ষেত্রেও। ভারতের সঙ্গে এই গাঁটছড়ায় যোগ দিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে এই সহযোগিতার চুক্তি করতে যাচ্ছেন

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা? তবে কি এখন থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি আর আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত? তবে কি এখন থেকে ভারতীয় পুলিশ সেনাবাহিনী বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে ঢুকে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিককে ধরে নিয়ে যেতে পারবে? তবে কি বাংলাদেশের বাজারে চলবে ভারতীয় মুদ্রা? আমাদের সমরাস্ত্রের সবটাই কেনা হবে ভারত থেকে? ভারতীয় নাগরিকরা বিনা পাসপোর্টে বাংলাদেশে ঢুকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে, বসতি স্থাপন করতে পারবে? সংশয় দেখা দিচ্ছে সার্ককাঠামো ভেঙে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতায় রাষ্ট্রগুলোর চেহারা দেখে। এ নিয়ে দেব গৌড়া বাবু যেকথা বলেননি, পারিষদরা এমনকি তার চেয়েও বেশি বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেব গৌড়ার সঙ্গে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, এই উপ-আঞ্চলিক গ্রুপ হবে সার্কের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। এটা বিশেষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।' এ সম্পর্কে দেব গৌড়া সাংবাদিকদের কোন কথা বলেননি। কারণ তার সময় কম ছিল।

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যের (সাতকন্যা) বিদ্রোহ দমনে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহার করতে দিয়ে বাংলাদেশে একদিকে যেমন স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের টার্গেটে পরিণত করা হচ্ছে, অপরদিকে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার নামে বাংলাদেশকে ভারতের সহযোগী অনুগামী রাষ্ট্রে পরিণত করার এই হীন চেষ্টা চলছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মোস্তফা কামাল ৬ জানুয়ারি এক সেমিনারে বলেছেন, এই ব্যবস্থা অসম শক্তির সমাবেশ ঘটাবে। সার্ককে ধ্বংস করার জন্যই মূলত এই উপ-আঞ্চলিক গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এ অঞ্চলে ভারতের ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের ফলেই এই প্রস্তাব করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন, ভারত বাংলাদেশকে কখনোই ইকোয়াল পার্টনার হিসেবে দেখেনি। ভারত বাংলাদেশকে নেপাল ও ভুটানের মত ট্রিট করতে চায়। সেজন্য বাংলাদেশ বরাবরই এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এসেছে। এ কারণে বাংলাদেশ ফারাক্কার বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে তুলেছে। তিনি বলেন, ভারত মনে করে সাবরিজুয়্যানাল গ্রুপ হলে ছোট ছোট দেশগুলোর সমস্যা সমাধান হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বাংলাদেশ কখনোই 'আনইকোয়াল পার্টনার হয়ে থাকতে চাইবে না।' ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ তার প্রতিক্রিয়া জানাবে। তিনি বলেন, আস্থা অর্জন করতে হলে ভারতকে বড় পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশকে ইকোয়াল পার্টনার মনে করতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশের সমমর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করার জন্য যে প্রয়াস নিয়েছে, জনগণের কাছে এ জন্য নিশ্চয়ই তার মাসুল তাদেরকে দিতে হবে।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার নিঠুর খেলা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৯ জানুয়ারি '৯৭ বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষের সঙ্গে এক নিদারুণ কৌতুক করেছেন। অসত্য অর্ধসত্য কথার ফানুস উড়িয়ে শেখ হাসিনা পদ্মার ধুধু বালুচরে পানি প্রাপ্তির বক্তৃতা করে জনগণকে বোকা বানানোর প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন।

গত ৯ ডিসেম্বর '৯৬ থেকে মানুষ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীদের কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছেন এক আওয়াজ—পানি আসছে, গঙ্গার পানি আসছে। ১২ ডিসেম্বর '৯৬ ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তির সম্পাদনের পর সরকারের সকলে মিলে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন যে, ১ জানুয়ারি '৯৭ থেকে পদ্মায় ঢেউ তুলে পানি আসবে। দীর্ঘকাল ধরে জেগে ওঠা চর ডুবে যাবে। সেখানে কুলুকুলু রবে প্রবাহিত হবে পানি। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে যে রাজপথ তৈরি হয়েছে, তা আর থাকবে না। সেখানে জমে উঠবে ফেরিঘাট। দোকানপাট, পসরা সাজিয়ে বসে গেল লোকজন। পানি আসছে।

আর সরকারের তরফ থেকে অবিরাম বলা হতে থাকল, স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারই ভারত থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করে এনেছে। কোথায় সে পানি। সে পানি দেখার জন্য সত্যি সত্যি পদ্মার দু'পাড়ে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হতে থাকল। কেউ কেউ কেটে নিয়ে গেল চরের অপরিপক্ক শস্য—পানি যদি ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব কিছু!

আওয়ামী লীগের স্তুতিকার সকল পত্র-পত্রিকা একযোগে প্রচার করতে থাকল, পদ্মায় বান ডাকতে যাচ্ছে। সে সব খবর পড়ে ঢাকা থেকেই অনেক লোক, রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার ছুটে গেলেন ৩১ ডিসেম্বর পদ্মা নদীর তীরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে। কিন্তু ধোকা, সবই ধোকা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ. ডি. দেবগৌড় স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন সন্ধির মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না যে, মরা গঙ্গা জানুয়ারির প্রথম মুহূর্তেই যৌবনবতী হয়ে উঠবে। তা সত্ত্বেও কেন জনগণকে এমন আশা দেয়া হল?

আশা শুধু দেয়া হল না, সরকারের মন্ত্রীরা জহর কোট আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি দেখার জন্য। পানি আসেনি। জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিল চরম হতাশা। তারা সরকারের পানির ফুটো কলসি দেখতে পেলেন। পানি নেই। তারা পদ্মাপাড়ে মিছিল করেছেন, সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছেন। তারপর চরম হতাশা নিয়ে ফিরে গেছেন যার যার ঘরে।

www.pathagar.com

সরকারের উচ্চপদস্থ লোকেরা বলতে থাকলেন, না না, পানি আসছে, কিন্তু পদ্মার ওপর দীর্ঘকাল ধরে জমে যাওয়া বুভুক্ষু বালুকারাশি গ্রাস করে নিয়ে গেছে পদ্মার পানি। চমৎকার যুক্তি। কিন্তু তাতেও জনগণের মন ভরল না। তারা বুঝতে পারলেন, শেষ পর্যন্ত পানির নামে ধোকাবাজিরই শিকার হয়েছে তারা।

এতে প্রমাদ গুনলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি পদ্মাপাড়ের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বড় ঘটা করে জনসভা ডাকা হল পদ্মার চরে। ছুটে গেল পুলিশ, দমকল বাহিনীর লোক। পদ্মার চরে যেখানে ১ জানুয়ারি থেকে পানি প্রবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সেখানে ইট বিছিয়ে নির্মাণ করা হল হেলিপ্যাণ্ড-হেলিকপ্টার নামার জায়গা। তারপর ওই চরেই তিনি ডাক দিলেন জনসভার।

৯ জানুয়ারি সে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সে জনসভায় সাধারণ মানুষ আসেনি। বিভিন্ন রকম যানবাহন করে আনা হয় দলীয় কর্মীদের। তারা নানা রঙের ব্যানারে শেখ হাসিনার স্তুতিবন্দনা লিখে তার ছবি গেঁথে এসে সমবেত হল পদ্মাচরের জনসভায়। ওপরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। নিচে ধুধু বালুচর, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েক শ' লোক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পানির নামে এত বড় কৌতুক বোধ হয় আর কোন সরকারপ্রধান করেননি।

যেখানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল, আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তো সেখানে কুলুকুলু রবে বয়ে যাওয়ার কথা পানি। প্রমত্তা হয়ে ওঠার কথা পদ্মা। জনসভার ভেন্যু তো হবার কথা ছিল পদ্মার তীরে, পদ্মার মাঝখানে নয়। তা হলে এ আয়োজনের অর্থ কী দাঁড়াল? ধোকা এবং ধোকাই।

সে কষ্টায়োজিত জনসভায় ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবেত কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'বিগত সরকার ফারাক্কা নিয়ে চিৎকার করেছে, লং মার্চ করেছে এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে। আমরা গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা লাভ করেছি। পানি আসছে।'

দারুণ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি উল্লেখ করেননি যে, তাঁর প্রয়াত পিতা শেখ মুজিবুর রহমান কোন রকম চুক্তি ছাড়াই ১৯৭৫ সালে ভারতকে পানি প্রত্যাহারের লাইসেন্স দিয়েছিলেন। সে পরীক্ষার নামে পদ্মার পানি প্রবাহে ভারত খামখেয়ালির আশ্রয় নিলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে লাখো মানুষ গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে মিছিল করেছিল ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৭ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ফারাক্কা ইস্যু জাতিসংঘে উত্থাপন করেন। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের শরণাপন্ন হন। আর সে উদ্যোগের ফলেই শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে পানি চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, সে চুক্তি ছিল সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অনুকূলে। তাতে বাংলাদেশের জন্য ছিল গ্যারান্টি ক্লজ। ছিল তৃতীয় পক্ষের সালিসি ব্যবস্থা। এবারের পানিচুক্তি ৩০ বছরের চুক্তি হিসেবে উল্লেখ করে যারা বগল বাজাচ্ছেন তারাও নিশ্চয়ই জানেন, এবারের চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য কোন গ্যারান্টি ক্লজ

www.pathagar.com

নেই, তা আছে ভারতের জন্য। বিরোধ বাধলে ভারত যা বলবে বাংলাদেশকে তা মেনে নিতে হবে। কারণ, তৃতীয় পক্ষের সালিসির কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানি ছেড়ে দেয়া হয়েছে ভারতের দয়ার ওপর। আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পানি চুক্তি হয়েছে মওসুমভিত্তিক এবং সে মওসুমী চুক্তি ভারত না মানলে বাংলাদেশের করার কিছু নেই।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পানি আসছে। পানি যদি এসেই থাকে, তো চরে মঞ্চ সাজিয়ে হেলিপ্যাড গড়ে আপনারা সেখানে জনসভা করলেন কেমন করে?

আরও একটি কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নিজ হাতে কোদাল নিয়ে দু'কোপ দিয়ে নদী পুনর্খনন উদ্বোধন করে আওয়ামী নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা যেন স্বেচ্ছাশ্রমে নদী খনন কাজে অংশ নেন।

কেন? শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন খাল খনন ও নদী পুনর্খনন কর্মসূচি উদ্বোধন করতেন তখন তিনি কত রঙ্গ-কৌতুক করেছেন এসব নিয়ে। কিন্তু এখন কেন নদী খনন কাজে তাকে কোদাল হাতে নিতে হল। তবে কি শহীদ জিয়া ও বেগম খালেদা জিয়া সঠিক কাজই করেছিলেন? তবে কি তারা নেতৃত্বের দিক থেকে অনেক বেশি দূরদর্শী ছিলেন? তা না হলে, যখন পানিচুক্তি ছিল না, তখন খাল বা নদী খনন পুনর্খনন কাজে হাত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। আর পানি আসছে, পানি আসছে বলে এখন কেন বহু সমালোচিত নদী খনন, পুনর্খনন কাজে কোদাল ধরতে হচ্ছে শেখ হাসিনাকে? তবে কি পানি চুক্তির ভেতরে পানি আসার কোন বন্দোবস্তই নেই? সাধারণ মানুষের এখন এটাই প্রশ্ন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানোর পাঁয়তারা

ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের। গোটা ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে এই সাতটি রাজ্যের ভূ-প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতাও সব সময় পরিদৃশ্যমান। তবে কাশ্মীর বা পাঞ্জাবের স্বাধীনতা আন্দোলন যে রক্তক্ষয়ী পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, ওই সাতটি রাজ্যের পরিস্থিতি এখনও এত প্রকট রূপ ধারণ করেনি। এই সাতটি রাজ্যকে 'সেভেন সিস্টার' বা সাত কন্যা বলে অভিহিত করা হয়।

ভারতের এই সাতটি রাজ্যই বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এগুলো হল : আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচর ও মনিপুর। এর মধ্যে চারটি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। এই চারটি রাজ্য হচ্ছে : আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম ও ত্রিপুরা। আর এই সকল রাজ্যেরই কোন না কোন অংশের সীমান্ত আছে চীন ও মায়ানমারের সঙ্গে।

এদিকে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে বাংলাদেশ ও নেপালের মাঝখানে সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ২২ কিলোমিটার। ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের ভূমি সংযোগ ওই ২২ কিলোমিটারই। এই এলাকা খুবই দুর্গম এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও এখানে নামমাত্র। যদি কোনদিন এই সামান্য সড়ক পথ সাত কন্যার বিদ্রোহীরা বন্ধ করে দিতে পারে, তা হলে দিল্লীর সঙ্গে এই সাতটি রাজ্যের আর কোন সংযোগ থাকবে না। ফলে এই রাজ্যগুলোর স্বাধীনতার পথ সুগম হবে। সেক্ষেত্রে এই সাতটি রাজ্যে ভারতীয় কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে নেপাল বা বাংলাদেশকেই ব্যবহার করতে হবে। অনেক ষড়যন্ত্রের পর ভারত শেষ পর্যন্ত নেপালে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাতে ভারতের বহিঃসীমান্ত নিরাপদ হলেও সাত কন্যা'র অপারেশনের ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা হয়নি। কারণ, নেপাল এমনিতেই দুর্গম ও পার্বত্য রাষ্ট্র। তার ভেতর দিয়ে সাত কন্যার ভারতীয় সৈন্য সমাবেশ বা সমরাস্ত্র পারাপার দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া নেপালের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পাড়ি দিয়ে শুধুমাত্র একটি রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব।

আর বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে একসঙ্গে সাত রাজ্যের চারটিতে এবং সেখান থেকে অতি দ্রুত বাকি তিনটিতে প্রবেশ করা যাবে। সে কারণেই ভারতের দরকার বাংলাদেশে একটি তাঁবেদার সরকার। সে সরকার ভারত নানা কৌশলে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভারত মনে করে, চীন এবং চীনের হয়ে মায়ানমার এই সাতটি রাজ্যের বিদ্রোহীদের মদদ দিয়ে যাচ্ছে। সরবরাহ করছে অস্ত্রশস্ত্র। কারণ, শত মার্কিন-

www.pathagar.com

ভারত প্রয়াস সত্ত্বেও এখনও মায়ানমারে সামরিক জান্তা বহাল আছে। চীনের সঙ্গে তাদের রয়েছে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব। চীনের সঙ্গে মায়ানমারের রয়েছে দীর্ঘ সীমান্ত। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বাংলাদেশকে তাঁবে রাখা চাই-ই।

এদিকে ভারত তার সাত রাজ্যে বিদ্রোহে চীনের মদদ দান নিয়ে খুব বেশি উচ্চবাচ্য করার ক্ষমতা রাখে না। কারণ, ১৯৬২ সালে ভারতের চীন-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। এরপর সমরাস্ত্রের দিক দিয়ে এবং জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত অনেকখানি এগিয়ে গেলেও, তা চীনের সমকক্ষ কিছুতেই নয়। ভারত এখন পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বর্তমান রাশিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারত বিপুল অস্ত্রশস্ত্র নিজেই তৈরি করছে। কিন্তু অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে সমরাস্ত্রের দিক থেকে ভারত এখনও পিছিয়ে। অপর দিকে রাশিয়ার অর্থনীতি ও বিপন্ন দশার। রাশিয়াও এখন আর বন্ধুত্বের দামে ভারতকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিতে পারছে না। তা ছাড়া রাশিয়ান অস্ত্রের মান যে কী রকম তা আবার প্রমাণিত হয়েছে ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়। পৃথিবীর মধ্যে ইরাকই ছিল একমাত্র রাষ্ট্র, যে ন্যায্য ও নগদ মূল্যে রাশিয়া থেকে অস্ত্র কিনত। কিন্তু তাদের অত্যাধুনিক স্কার্ড ক্ষেপণাস্ত্র যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তারপর রাশিয়ান অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অনেকেই। এখন রুশ অস্ত্রের সবচেয়ে বড় চালান ভারতই গ্রহণ করে।

অপর দিকে চীন হালকা সমরাস্ত্রে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তির অধিকারী। বাংলাদেশও চীনা অস্ত্রশস্ত্রের বড় ক্রেতা। যদিও ভারত এখন চাইছে বাংলাদেশ চীনা অস্ত্রশস্ত্র বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ভারত থেকেই কিনুক। একই শর্ত সে আরোপ করেছিল শ্রীলঙ্কার ওপর ১৯৮৭ সালে। ওই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মি. রাজীব গান্ধী শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস জয়বর্ধনকে যে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল সে চুক্তিতেও একই কথা ছিল। সে চুক্তি ভারত পুরোপুরি বাস্তবায়িত করতে পারেনি। তারপর অবশ্য ভারত মহাসাগর দিয়ে অনেক পানিই গড়িয়ে গেছে। চীন অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে এবং তার শক্তি ও সাফল্য সম্প্রতি প্রমাণ করেছে তাইওয়ানের উপকূলে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও চায়নি যে চীনও শক্তির পরীক্ষা করুক। কিন্তু চীন যুক্তরাষ্ট্রের পরোয়া করেনি। তাছাড়া চীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তাতে সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। চীনের শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধি গত কয়েক বছর ধরে ২৩ শতাংশেরও বেশি চলছে। ফলে শীঘ্রই রাশিয়ার মত পেছনমুখী হবার কোন সম্ভাবনা চীনের নেই। এই পরিস্থিতিতে ভারত চীনের দিকে কড়া চোখে তাকাবার সাহস করবে না।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতীয় কাঠামোর ভেতরে সাত কন্যার ভূ-প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। তাই তারা ভারতীয় কাঠামোর বাইরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যে সকল কারণে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছিল ১৯৭১ সালে, সাত কন্যার স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার সকল উপাদান বিদ্যমান। বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিকভাবে

www.pathagar.com

সফল হয়ে ওঠে, যা বিএনপি শাসনামলে হচ্ছিল, তা হলে সাত কন্যার নাগরিকদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জোরদার হয়ে উঠবে। সে কারণেই ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা নস্যাৎ করে দিয়ে নেপালের মত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্থবির করে ফেলা। তার জন্য যে সরকারের দরকার ছিল, ভারত তা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে।

এখন শুরু হতে যাচ্ছে সাত কন্যার ওপর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অভিযান। ট্রানজিটের নামে এক দিকে সাত কন্যার ওপর সামরিক অভিযান অচিরেই জোরদার হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তা ছাড়া সাত কন্যার বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে ভারত-বাংলাদেশ অপারেশন পরিচালিত হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সাত কন্যার গেরিলাদের টার্গেট হবে বাংলাদেশ। শত্রুর মিত্রও শত্রু—এই সহজ সমীকরণ ঘটবে সাত কন্যার স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে। আর এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও তাদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ যে যুদ্ধ চলছিল সাত কন্যার অভ্যন্তরে, সে যুদ্ধ বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির কারণে বাংলাদেশেও সম্প্রসারিত হতে পারে। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব যেমন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে, তেমনি আমাদের অর্থনীতির ওপরও তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। বিএনপি শাসনামলে যে 'ইমার্জিং টাইগারে' পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ, তার সম্ভাবনা চিরতরে দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ভারতভুক্ত জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন দেয়া যাবে না কেন?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন হাসিনা-এরশাদ-রবের কোয়ালিশন সরকার বেসামাল অবস্থায় পড়ে এখন মানুষের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে নেবার জন্য সুকৌশলে নানারূপ ফন্দি-ফিকির করছে বলেই মনে হয়। সংবিধান মান্যকারী চিন্তাশীল নাগরিকদের সকল স্বাধীনতা হরণ করে নেবার জন্য তারা এখন নানারকম কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন শুরু করেছে নানা কৌশলে। আর তার জন্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন। সরকারের বিভিন্ন ঢাকবাদক সংবাদপত্রে এসব খবর এমনভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে, যাতে মনে হতে পারে যে, কোন জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতার প্রতি নৈতিক সমর্থন জানানো একটি বিরাট অপরাধ।

বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যেসব অধিকার দেয়া হয়েছে, সরকার ভারতের লেজুড়বৃত্তি করতে গিয়ে সেগুলোও অস্বীকার করতে যাচ্ছে। এ প্রশ্ন আগে কখনও উত্থাপিত হয়নি। ভারতে জাতিসত্তার গোলযোগ ও স্বাধীনতার আন্দোলন আজকের নয়। যেসব আন্দোলনের প্রতি শুধু বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশী জনগণ নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগোষ্ঠীও সমর্থন প্রদান করেছে। যেমন কাশ্মীর সমস্যা। কাশ্মীরের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে শুরু করেছেন ৫০ বছর আগে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই। তা নিয়ে সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন। জাতিসংঘও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মেনেছে। ওআইসিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একই কথা বলা যায় শিখদের স্বাধীন খালিস্তান আন্দোলন সম্পর্কেও। শিখরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের বহু জাতিগোষ্ঠী ও গ্রুপ, ব্যক্তি তাদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে নৈতিক কিংবা আর্থিক সমর্থন জুগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে রক্তক্ষয়ী লড়াই অব্যাহত আছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃবৃন্দও কখনও কোন ফোরামে কাশ্মিরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিরোধিতা করেননি। বাংলাদেশের মানুষ কাশ্মিরিদের ওপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক বিচারক সমিতিও এই বর্বরতার বিরুদ্ধে অবিরাম কথা বলছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার পারলে গিয়ে কাশ্মিরিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলনের সমর্থনকারীদের টুটি চেপে ধরতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ধরনের মনোভাবের বিরোধিতা করা হয়েছে। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : 'রাষ্ট্র ২৫(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।'

ভারত যে একটি জাতির রাষ্ট্র নয় একথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন স্বীকার করে গেছেন, তেমনি ভারতীয়রাও স্বীকার করেন। বহু জাতির গোষ্ঠী নিয়েই ভারতীয় ফেডারেশন। সেখানে আসামী বা মনিপুরী, গুর্খা, নাগা বা মিজো জাতি যদি তাদের নিজস্ব সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে চায়, তবে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেরও তা সমর্থন করার কথা। কারণ এটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ সমর্থন করলেও তাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হুমকি দেবার অধিকার কি সরকারের রয়েছে?

অপরদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

'৩৯(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে।

(ক) প্রত্যেক নাগরিকদের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।'

বাংলাদেশের কোন নাগরিক যদি তার চিন্তা ও বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে মনে কনে যে ভারতের করতলগত কিংবা ভারত কর্তৃক দখলীকৃত (যেমন মনিপুর ও সিকিম) কোন জাতি গোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি নৈতিক দেবেন, তা হলে সরকার তাতে বিরূপ হবেন কেন? বর্তমান সরকারের কাছে ভারত হয়ত বন্ধুদেশ। কিন্তু বন্ধুত্বমূলক কোন আচরণ স্বাধীনতার পর থেকে ভারত আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে করেনি, এমনকি ভারত-বন্ধু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সম্পাদিত পানি চুক্তি নিয়েও ফেরেববাজি করেছে, সেই বন্ধু দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ধুয়া তুলে সরকার বলতে পারে, আপনার চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করলাম। ভারতভুক্ত জাতিগোষ্ঠীর কোন স্বাধীনতা আন্দোলনে নৈতিক সমর্থন দেবার জন্য আপনার বিবেক যতই তাড়িত হোক, আপনি তা প্রকাশ করতে পারবেন না, তা হলেও সে জন্য সরকারকে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে। সে রকম কোন আইন কি জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে? তা না হলে এ নিয়ে চতুর্দিকে এমন চোখ রাঙানি দেয়া হচ্ছে কোন অধিকারে? বর্তমান সরকারের সকল লোক মেধাহীন বলে আমি মনে করি না। তাদের মধ্যেও অনেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন, মেধাবী ইতিহাস-সচেতন লোক আছেন। একটু পেছনে তাকালে তারা

www.pathagar.com

দেখতে পাবেন, আমরা সমর্থন দিয়েছি নেলসন ম্যাণ্ডেলার আন্দোলনে, আমরা সমর্থন দিয়েছি প্যালেস্টাইনদের আত্মনিয়ন্ত্রণাদিকারের আন্দোলনে, আমরা সমর্থন দিয়েছি বসনীয়দের আত্মরক্ষার লড়াই, আমরা সমর্থন দিয়েছি জিম্বাবুইয়ের উপনিবেশ মুক্তির আন্দোলনে। কই, কখনও তো পেছনে ফিরে দেখিনি, কে বন্ধু আর কে বন্ধু নয়। আমরা সে সমর্থন দিয়েছি বিশ্বব্যাপী মুক্তিকামী মানুষের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা থেকে, আমাদের বিবেক বোধের তাড়না থেকে। তাতে তো দোষের কিছু হয়নি।

তেমনিভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্র ছিল লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া। গোটা ইউরোপ, সেখানকার, নাগরিক, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সবাই তো এক যোগে তাদের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছি এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাবার আগেই ওই তিনটি জাতিগোষ্ঠী তাদের রাজ্যকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তখনও তো কেউ বলেনি যে, এতে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। তবে কি এখনকার বাংলাদেশ সরকার মুক্তবুদ্ধি আর স্বাধীন চিন্তার টুটি চেপে ধরে দেশকে পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছেন?

শেষ কথায় আসা যায়। বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য আমরা যখন যুদ্ধ শুরু করলাম, তখন ভারত ও রাশিয়া আমাদের সে যুদ্ধের প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে, বিরোধিতা করেছে পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ অনেক বড় বড় শক্তি। যারা নীরব ছিল সেসব দেশের নাগরিকরা প্রকাশ্যে এই মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করেছে। কই এরকম সমর্থনের দায়ে ব্রিটেন বা ফ্রান্স কি তাদের কোন নাগরিককে হুমকি দিয়েছে? যুক্তরাষ্ট্রেরও অসংখ্য নাগরিক ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের কাউকে কোন হুমকিও দেয়নি, কিংবা তাদের কাউকে গ্রেফতারও করেনি। সভ্য জগতে এটাই নিয়ম।

সভ্য জগতের নিয়মকানুন, আর সংবিধানের বিধি-বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের যে-কোন নাগরিক পৃথিবীর যে-কোন জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমর্থন যোগানোর অধিকার রাখেন। এক্ষেত্রে কোন দলননীতির আশ্রয় নিলে সরকারই সংবিধান লঙ্ঘনের জন্য দায়ী থাকবেন। মানুষের বিবেক-বুদ্ধি আর স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করে কোন স্বাধীন জাতি কখনও সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না।

www.pathagar.com

অপমানে হতে হবে সবার সমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন, তখন তিনি অবিরাম বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেই কেবল ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। শেখ হাসিনার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত ৩০ বছরের তথা দুই বছরের তথা এক মওসুমের পানিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেছেন, এই চুক্তি হয়েছে অনন্তকালের জন্য। গত ১২ ডিসেম্বর এই চুক্তি সম্পাদিত হবার পর কোন কোন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী পত্রিকা ফাটিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। শেখ হাসিনাকে দেব-দেবীর সঙ্গে তুলনা করে জয়গাঁথা রচনা করেছেন। কিন্তু তারা হয়তো এই চুক্তির পেছনে অবমাননাকর, লাঞ্ছনাকর ইতর ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। সামান্য আত্মসম্মানবোধ যাদের আছে, তারাই এই চুক্তির জন্য গ্লানিবোধ করতেন, উৎফুল্ল হতে পারতেন না। এই পেছনের ইতিহাস এক করুণ আত্মসমর্পণের ইতিহাস। এর পেছনের ইতিহাস আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননার ইতিহাস। এর পেছনের ইতিহাস জাতি হিসেবে আমাদের চূড়ান্ত অপমানের ইতিহাস। এমনকি মহাকালী নদীর পানি বণ্টনের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা ভারত নেপালকে দিয়েছে, বাংলাদেশকে তাও দেয়নি। তাই নিয়ে যে পরিমাণ লাফালাফি হল, সেটাও দেখবার মত এবং পড়বার মত।

গত ২৬ ডিসেম্বর সংখ্যা ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় সৈয়দ কামালউদ্দীন যে রিপোর্ট করেছেন তাতে এই অপমানের বিস্তারিত বিবরণ আছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন হাসিনা-এরশাদ-রব-এর কোয়ালিশন সরকার চেয়েছিল যে, পানি বণ্টন সম্পর্কিত একটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক। কিন্তু এই চুক্তির ক্যাটালিস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, চুক্তি হবে দুই বছর মেয়াদী, তার বেশি নয়। তাঁর এই বক্তব্য থেকে মনে হয়েছিল, চুক্তি হয়তো হবে দুই বছর মেয়াদী। কিন্তু দেখা গেল শেখ হাসিনার কোয়ালিশন সরকার দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অনবহিত রেখে চুক্তি করেছেন ৩০ বছর মেয়াদী। যা শুনতে খুব বড় শোনায় বটে, কিন্তু আসলে এই চুক্তি হয়েছে শুকনো মওসুম মেয়াদী। আর এতে বাংলাদেশের স্বার্থ কোনভাবেই রক্ষিত হয়নি, বরং ভারতের স্বার্থরক্ষায় দাসখতে স্বাক্ষর করে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রসঙ্গত এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হল, যে কয় ফোঁটাই হোক, পানি ভারত দিতে পারে। কিন্তু সে পানি দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার প্রয়োজন কেন হয়? পানি যদি ভারত দিতেই পারে তা হলে

www.pathagar.com

তা দেয়নি কেন বিএনপি সরকারের আমলে? তবে কি ভারত এমন এক পরিস্থিতি চেয়েছে যাতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারে এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাদের গোপন চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে? এটাই যদি ভারতের উদ্দেশ্য না হবে তা হলে যত কমই হোক, ১৯৮৮ সাল থেকে শুকনো মওসুমে ভারত কেন পানি ছাড়ল না ফারাক্কায়?

অর্থাৎ ভারত চেয়েছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক, তার পর বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের পানিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। অন্য কোন সরকারের সঙ্গে তারা পানিচুক্তি স্বাক্ষর করবে না।

নামে যত বড়ই শোনাক, তা শোনাবার দরকার ছিল বাংলাদেশের মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য, আসলে এই পানিচুক্তি হয়েছে মওসুম মেয়াদী। এবং এই মওসুম মেয়াদী চুক্তিতেও যে বাংলাদেশ কোন পানি পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেটাও নির্ভর করছে সম্পূর্ণরূপে ভারতের খামখেয়ালির ওপর। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল সৈয়দ কামালউদ্দিনকে নয়াদিল্লীতে জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার পানি নিয়ে কোন দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হতে পারে না। চুক্তি হবে অন্তবর্তীকালীন ও স্বল্পমেয়াদী। আসলেও ঘটেছে তাই।

ভারতীয় পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করলেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য পানি ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে না নিয়ে যাদের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা চালানো হয়, তারাও ছিলেন আমলাই। গত ৭ ডিসেম্বর কলকাতার একটি ইংরেজি পত্রিকা খবর দেয় যে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দিল্লী সফরের ৪৮ ঘণ্টা আগে পানির প্রাপ্যতা সম্পর্কে উভয় দেশের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দে:য় এবং বাংলাদেশ শুকনো মওসুমে ফারাক্কায় প্রাপ্ত পানির ফিফটি ফিফটি অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক বণ্টন ব্যবস্থা মেনে নিতে অস্বীকার করে।

পরদিন অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর একই পত্রিকার সংবাদে বলা হয়, নতুন ধারার সংযোজনের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার মতপার্থক্য দূর হতে পারে। শুকনো মওসুমে ১০ দিন অন্তর অন্তর উভয় দেশ বেশি পানি গ্রহণ করবে। অর্থাৎ শুভঙ্করের ফাঁকির মাধ্যমে যাহা বাহান্ন তাহাকেই তিপ্পান্ন বলে চালানো হল। পানির প্রবাহ ও বণ্টন রইল একই। একই দিন পত্রিকাটিকে একজন সরকারি কর্মকর্তা জানান যে, উভয় পক্ষই বেশি পানি চায়। কিন্তু শেখ হাসিনার দিল্লী সফরকালে যদি কোন চুক্তি সাক্ষরিত না হয়, তা হলে সেটা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আর শেখ হাসিনার জন্য একটি পানিবণ্টন চুক্তি নিয়ে দেশে ফেরা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই চুক্তি বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে তার জন্য খুব সহায়ক হবে।

গত ১২ ডিসেম্বর নয়াদিল্লী পানি বণ্টনের চুক্তিপত্রের নামে শেখ হাসিনা দেশের স্বার্থ ভারতের কাছে চিরতরে বিকিয়ে দেবার যে দলিলনামায় স্বাক্ষর করেছেন সে সম্পর্কে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। যার কিছু কিছু বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাতেও উদ্ধৃত হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর সম্পাদিত ওই ধোঁকাবাজির পানি চুক্তিতে বলা হয়েছে, শুকনো মওসুমে পানির প্রাপ্যতা ও বণ্টন নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে সে সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে সরকারি পর্যায়ে বৈঠক করা হবে। সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন

www.pathagar.com

উত্থাপিত হবার কথা। কারণ, সরকারি পর্যায়ে ওই বৈঠক ডাকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত লোক উপস্থিত থাকা, তাদের তথ্যপ্রমাণ হাজির করা, আলাপ-আলোচনা করা, সমঝোতায় উপনীত হওয়া প্রভৃতি বিষয় নিষ্পত্তি করতে করতেই বাংলাদেশের ১০ দিন চলে যাবে। তারপর বেশি পানি পাওয়ার ভারতীয় ১০ দিন শুরু হবে। এভাবে চরম পানি সঙ্কটের সময় ভারত ১০ দিন পার করে দিতে পারলে কার্যত মে মাসে কোন পানিই বাংলাদেশকে দিতে হবে না। তা হলে উপায়? এরকম অবস্থায় তৃতীয় কোন পক্ষের মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেছিল বাংলাদেশ। আর যায় কোথায়, কোন সাহসে বাংলাদেশ এরকম প্রস্তাব করল, তা নিয়ে ভারত সরকার কষে লাগাল ধমক। এরকম প্রস্তাবে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সালমান হায়দার ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'যান, ঢাকার লোকদের গিয়ে বলে দিন, ভদ্র মহাশয়গণ, যদি মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, তা হলে পানি নিয়ে কোন চুক্তিই হবে না।' ভারত সরকারের এই মনোভাবের কারণে আমাদের নতজানু সরকারের কর্মকর্তারা মধ্যস্থতার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে জানে বেঁচে গেছেন।

পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের কর্মকর্তারা নাকি ওই আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার কথা বলতে সাহস করেছিলেন মহাকালী নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি দেখে। মহাকালী নদী নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে আছে যে, চুক্তির কোন ধারা নিয়ে দু'দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তা হলে তারা আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার জন্য যেতে পারবেন। আর তাই দেখে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বিরোধের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার কথা বলতে সাহস পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ভারতীয় পক্ষ বলেছে, 'মহাকালী চুক্তি একটি বাণিজ্যিক চুক্তি আর ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি নিতান্তই শুভেচ্ছার স্মারক। তাই দু'দেশ যখন পরস্পরকে গ্রহণ ও সহযোগিতা করতে যাচ্ছে, তখন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রস্তাব চুক্তিটির মূল চেতনার পরিপন্থী হবে।'

ভারতীয় ওই পত্রিকার রিপোর্টে এ নিয়ে আর তেমন কিছু নেই। এ ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ পক্ষ ভারতীয় প্রভুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল কি না, আমাদের জানা নেই।

সাপ্তাহিক হলিডে-তে প্রকাশিত এই পেছনের কাহিনী থেকে একটাই প্রমাণিত হয় যে ভারতের কাছে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নেপালের যে মর্যাদা আছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের সেটুকু মর্যাদাও নেই।

আসলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত এ ধরনের চুক্তিতে মধ্যস্থতাকারীর বা সালিসীর ধারা থাকাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তা একটি দাসখত এবং আত্মসমর্পণের একটি নিকৃষ্ট দলিল। এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে এবং রাজ্য ও রাজ্য সরকারের মধ্যেও নয়। আমরা মনে করি, এই চুক্তি গোটা জাতির জন্য অপমান। অপমান হতে হবে আমাদের সবার সমান।

আর এ রকম একটি চুক্তি সম্পাদন করে হাসিমুখে ফিরে এসে সব কিছু জনগণের কাছ থেকে আড়াল করার নামই বোধ হয়, কিল খেয়ে কিল হজম করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতজানু সরকার করলও তাও।

www.pathagar.com

ধিক্, এই সংকীর্ণ মানসিকতা

শেষ পর্যন্ত ভারতের 'ঐতিহ্যবাহী গণতন্ত্র' আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। ভারত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ বলে যারা সবসময় হুল্লা-চিল্লা করেন, তারা এখন কি জবাব দেন সেটাও দেখার বিষয়। একই সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণতন্ত্র চর্চার রীতি-নীতিও সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

গত ৬ ও ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন ভারতের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেব গৌড়া। তার এই দু'দিনের সফরকালে অনেক কাণ্ড ঘটেছে। অনেক আলাপ-আলোচনা, অনেক কথাবার্তা, অনেক সম্ভাব্য চুকিত নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৈশভোজ হয়েছে। সে ভোজ সভায় 'গণ্যমান্য' ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা করতালি দিয়েছেন, পানাহার করেছেন। তারপর বিরাট সাফল্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন হাড্ডালি হেড্ডা গৌড়া দেবে গৌড়া। কিন্তু এত কিছু করেও তিনি যা করেননি, তা হলো দেশের সর্ববৃহৎ বিরোধী দল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তার কোন সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়নি। ভারতেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে অর্ধশতাব্দী ধরে। বাংলাদেশে নতুন পর্যায়ে ৬ বছর। সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে রেওয়াজ অনুযায়ী দেব গৌড়ার উচিত ছিল বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করা। সে সাক্ষাতের আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়েছে ভারত, ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের পর বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর। তিনি দক্ষিণ এশিয়া ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সফর করে গেছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেছেন ১০, ১১, ১২ জানুয়ারি। তিনিও তার সফরকালে ঢাকায় ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। অনেক আলাপ-আলোচনা করেছেন, চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। প্রেস কনফারেন্স করেছেন। এবং আর যা করেছেন, তা হলো বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ।

ব্রিটেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ। কার্যত ব্রিটেনের অনুসরণেই তার সাবেক উপনিবেশের অনেক রাষ্ট্রের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ভারত বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হাড্ডেলি হাড্ডা দেব গৌড়া?

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সফরকালে জন মেজর কেন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করলেন, এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ১২ জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে। সাংবাদিকদের ঐ প্রশ্নের জবাবে জন মেজর বলেন, 'আমাদের দেশের রীতি হচ্ছে সরকার প্রধান দেশের বাইরে গেলে তারা সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলীয় নেতা বা নেত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমরা জানার চেষ্টা করি, গণতন্ত্র সেখানে কীভাবে কাজ করছে।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের বাংলাদেশ বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে এই সাক্ষাৎ ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়ে পড়ে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী দেব গৌড়া এবং সেখানকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাহ্যিক যতো বাগাড়াম্বরে ভরা থাকুক না কেন, কার্যত বিগত বছরে ভারতের রাষ্ট্র কাঠামোতে গণতন্ত্র খুব একটা সম্মানজনক অবস্থান করে নিতে পারেনি। তাদের মনমানসিকতায়ও গণতান্ত্রিক সহনশীলতা ও রীতিনীতি প্রতিফলিত হয় না। জন মেজরের কথায় ভারতের তাই অপমান হয়েছে। এ অপমান শোধরানোর জন্য ভারতের সরকার বা দূতাবাস কোন উদ্যোগ না নিলেও আত্মমর্যাদাহীন ভারতীয় সেবাদাস এক শ্রেণীর সাংবাদিক ও সংবাদপত্র একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। তারা সংবাদপত্রে এক কল্পকাহিনী ফেঁদে বসল দেব গৌড়ার-সাথে খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার প্রশ্নে। এমন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা স্বনামে সংবাদপত্রে পাতায় লেখা কেবল ভারতের নিকৃষ্ট মানের স্তাবকের পক্ষেই সম্ভব। কোন মর্যাদাবান সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঢাকার একটি দৈনিকে জন মেজরের চলে যাবার পরদিনই 'খালেদা জিয়া আগ্রহ দেখাননি' শিরোনামে রচনা লিখে বসলেন ভারতের স্তাবক ও আত্মমর্যাদাহীন এক সাংবাদিক। সে রিপোর্টে তিনি লেখেন যে, 'সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়ার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের আগ্রহ দেখাননি।' নির্ভর যোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে ওই সাংবাদিক লিখেছেন, 'সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সূচীতে বিরোধী দলের নেত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। যথাসময়ে যোগাযোগও করা হয়। কিন্তু বিরোধী দলের নেত্রীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।' ওই সাংবাদিক লিখেছেন, 'একই রীতি অনুযায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের সফরকালে বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সৌজন্য সাক্ষাতের বিষয়ে সমান গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট মহলে যোগাযোগ করা হয়। কিছুটা বিলম্বে হলেও এর প্রতি সাড়া মেলে। বিরোধী দলের নেত্রী রোববার বারিধারায় অবস্থিত ব্রিটিশ হাই কমিশনারের বাসভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।' আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে খবরটি সত্য। বাংলাদেশে বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির সমালোচনা করেছেন। ভারতকে ট্রানজিট দেবার বিরোধিতা করছেন, উপ-আঞ্চলিক গ্রুপ গঠনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি হয়তো ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ এড়িয়ে গেছেন—এমন ধারণা সাধারণ পাঠকের মনে জন্মাতে পারে। এমনকি

www.pathagar.com

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরকালে সেখানকার বিরোধী দলের নেতা বিজেপি'র অটলবিহারী বাজপেয়ীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। বাজপেয়ী তাতে নাখোশ হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। সেদিক থেকে বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেত্রী দেব গৌড়ার সাথে সাক্ষাৎ না করে অসৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন বলেই সকলের মনে ধারণা জন্মাতে পারে।

কিন্তু প্রকৃত চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেকথা প্রকাশ পেলো বিএনপি'র প্রতিবাদ থেকে। ১৫ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় ওই প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবাদ লিপিতে বিএনপি'র পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, 'এ ধরনের অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ দৈনিক বাংলার মতো ঐতিহ্যবাহী সংবাদপত্রের কাছ থেকে আমরা আশা করি না। আমরা মনে করি, এ ধরনের 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ হলুদ সাংবাদিকতারই নামান্তর।'

বিএনপি'র প্রতিবাদে বলা হয়, 'দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের আগ্রহ দেখাননি এবং সরকারের পক্ষ থেকে যোগাযোগের ভিত্তিতেই না কি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। সংবাদটি শুধু অসত্যই নয়, বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বেগম খালেদা জিয়ার সাক্ষাতের বিষয় নিয়ে সরকার অথবা ভারতীয় দূতাবাস কারও পক্ষ থেকেই কোন প্রকার যোগাযোগ করা হয়নি। যেখানে সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন পক্ষই যোগাযোগ করেননি, সেখানে বেগম জিয়ার আগ্রহ-অনাগ্রহের বিষয়টি অবান্তর। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী জন মেজর বাংলাদেশ সফরকালে তার সাথে বেগম খালেদা জিয়ার সাক্ষাতের বিষয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। সেই যোগাযোগের ভিত্তিতেই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এই সাক্ষাতের বিষয়ে কোন প্রকার যোগাযোগ করা হয়নি।'

বিএনপি'র প্রতিবাদ লিপিতে উল্লেখ করা হয়, 'ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আই কে গুজরাল বাংলাদেশ সফরকালে বেগম জিয়ার সাথে তার সাক্ষাতের সময় চেয়ে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর বাংলাদেশ সফরকালে ভারতীয় দূতাবাসের আমন্ত্রণে বিএনপি নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।'

এই প্রতিবাদ লিপির সাথে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার কোন ব্যাখ্যা ছাপা হয়নি। তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই মিথ্যা রিপোর্টটি সংশ্লিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকার কিংবা ভারত সরকার কেউই চাননি যে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেব গৌড়ার কোন সৌজন্য সাক্ষাৎ হোক। সংশ্লিষ্ট পত্রিকা ও সাংবাদিকের উদ্দেশ্যে 'মহৎ' ছিল। তিনিএ ধরনের একটি সৌজন্য বহির্ভূত কাজ করার দায় থেকে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে রক্ষা

www.pathagar.com

করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সরকার দুটি নিজেরাই গণতন্ত্র চর্চা করতে জানেন না, মিথ্যা সাফাই গেয়ে তাদের সহায়তা করা যাবে না। কোন দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রী অন্য কোন দেশ সফরে গেলে তিনি কী কী করবেন, কোথায় যাবেন, কী খাবেন, কোথায় থাকবেন, তা বহু আগেই পররাষ্ট্র দফতর নির্ধারণ করে রাখে। সুতরাং সাক্ষাৎকারের বিষয়টি দু'দেশের সরকার আগেই বাদ দিয়ে রেখেছিলেন। জনগণ বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ও ভারত সরকারকে এই সঙ্কীর্ণ মানসিকতার জন্য ধিক্কারই কেবল জানাতে পারে। অন্য কিছু নয়।

www.pathagar.com

হাসিনা সরকার সার্ক অকেজো করতে চাইছে?

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ১৮ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আগামী ২৩ নভেম্বর বা তার দু'একদিন আগে পরে ঢাকায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে সভানেত্রীত্ব করবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আই. কে গুজরাল ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ইতোমধ্যেই বৈঠকে যোগ দিতে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। জনাব সামাদ আজাদ বলেছেন, বেসরকারি খাতের সহযোগিতার মাধ্যমে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিন দেশীয় এই শীর্ষ সম্মেলন হবে সম্পূর্ণরূপে একটি বাণিজ্য বিষয়ক সম্মেলন। এই সম্মেলন দক্ষিণ এশীয় চতুর্ভুজের মত কিছু নয় এবং এতে সার্কের (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা) অপরাপর সদস্যের ভীত হবার কোন কারণ নেই।

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার সবই বাংলাদেশের স্বার্থানুকূল হোক বা না হোক ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে কার্যত ভারতের একটি স্যাটেলাইট রাজ্যে পরিণত করে ফেলেছে। জাতীয়ভাবে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, ভারত-বাংলাদেশ যৌথভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের সমঝোতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারত আনীত পুরুলিয়ায় অস্ত্র নিক্ষেপের কাল্পনিক যোগসাজস তদন্তের অনুমতি দান, সীমান্ত খুলে দেওয়া, ভারত থেকে পণ্য আমদানি করলে অতিরিক্ত শুল্ক সুবিধা প্রদান, ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর প্রদান, ভারতের স্বার্থের অনুকূলে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় তৈরি পোশাক, চামড়া শিল্প ও মাছসহ রফতানিমুখী শিল্পের ধ্বংস সাধন প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে এই সরকার। তাছাড়া শেয়ার বাজারে ভারতীয় ফটকা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা তুলে দেয়ার জন্য সরকার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক ইন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ফতুর করে পথে বসিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সরকার গঙ্গার পানি চুক্তির মত দেশের স্বার্থবিরোধী এমন চুক্তি করতে পারে-কল্পনাও করা যায় না। দেশ নয়, জনগণ নয়, ভবিষ্যত বংশধরগণ নয়, কেবল ভারত সরকারের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকার। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে, দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে অবিরাম সতর্ক করে দেয়া হলেও সরকার সেদিকে মোটেও কর্ণপাত করেনি, বরং নির্যাতনের মাধ্যমে এসব কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়ে একচ্ছত্র স্বৈরশাসনের মাধ্যমে ভারতকে তুষ্ট করতেই সরকারের সকল মেশিনারি ব্যস্ত। দেশের সাধারণ মানুষ সরকারের এই ভয়াবহ তৎপরতার কুফল এই মুহূর্তেই পুরোপুরি উপলব্ধি না করলেও ভবিষ্যতে যে করবে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু ভয় হয়, তখন খুব দেরী হয়ে যাবে না তো!

আন্তর্জাতিকভাবেও এই সরকার ভারতদর্শী। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এই সরকারের নীতি সারা বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। বিএনপি সরকারের আমলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ইমার্জিং টাইগারের যে মর্যাদা অর্জন করেছিল বাংলাদেশ, আওয়ামী লীগ সরকার সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। বিনিয়োগকারীরা আর বাংলাদেশে বিনিয়োগের কথা ভাবছে না। এই সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দিয়ে প্রকাশ্যে ভারতের তাঁবেদারিতে নিজেদের উৎসর্গ করে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা ভূলণ্ঠিত করে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী আসনে আওয়ামী লীগ সরকার প্রকাশ্যে জাপানের বদলে ভারতকে ভোট দিয়ে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যেমন খেলো করে তোলে, তেমনি অর্থনীতি ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী বিপর্যয় ডেকে আনে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী দেশ জাপান। ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পায়ন-উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাপানি সাহায্য গুরুত্বপুর্ণ। ভারত বাংলাদেশকে কোন রকম সাহায্য তো করেই না, বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে একে বাজার বানিয়ে রাখার নিয়ন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। তদুপরি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক খাতেই বাংলাদেশ ও ভারত প্রতিদ্বন্দ্বী। সে কথা বিবেচনায় না নিয়ে জাতিসংঘে জাপানের বদলে ভারতকে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অর্থনীতির সুদূরপ্রসারী ক্ষতি সাধন করেছে। তারপর থেকেই জাপান বাংলাদেশে ঋণ সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তাবলির ব্যাপারে কঠোর নীতি অনুসরণ করছে এবং ১৯৯৬–'৯৭ অর্থ বছরে জাপান পাঁচ কোটি ৯০ লাখ ডলারের প্রকল্প সাহায্য বাতিল করে দিয়েছে। জাপানের সঙ্গে সুসম্পর্কের সাথে জড়িত আছে বিশ্বব্যাংক, এডিবি প্রভৃতি সংস্থার ঋণের প্রশ্নও। এসব সংস্থায় জাপানের শেয়ার বড় বলে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্যও বড়। সরকার কূটনীতির ক্ষেত্রে ভারতের তাঁবেদারী করতে গিয়ে এসব বিষয় মোটেও আমলে আনেনি। ফলে বিকাশমান অর্থনীতি এখন ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

www.pathagar.com

আর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর থেকে আওয়ামী লীগ আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত ফোরামকে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে কেবলই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলছে। দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের খবরদারি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত এ অঞ্চলকে যে কাঠামোতে চায়, সার্ক-কে সেই কাঠামোর মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য আওয়ামী লীগ একের পর এক সব হাস্যকর প্রস্তাব উত্থাপন করে সার্ক কাঠামোকে নাজুক ভঙ্গুর ও আস্থাহীনতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে সার্ক গঠনের মূল লক্ষ্যই ছিল সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরস্পরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ভারতের খামখেয়ালী, একগুঁয়েমি ও খবরদারির কারণে সার্কে এখনও ভারতীয় স্বার্থ যতটা হাসিল হচ্ছে, অন্য কোন রাষ্ট্রের ততটা হচ্ছে না। সে ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থে সার্ককে যেখানে জোরদার করে তোলা জরুরী সেখানে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার বারবার উদ্ভট উদ্ভট সব প্রস্তাব উত্থাপন করে সার্কের ভেতরকার আস্থা যেমন বিনষ্ট করছে তেমনি সংশয় অবিশ্বাস সন্দেহের সৃষ্টি করছে, যা ইতিপূর্বে আর কোন দেশের কোন সরকার করেনি।

সার্কের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রের উন্নয়নের মুলনীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের এই জেহাদের কারণ অনুধাবন করা খুব বেশি কঠিন নয়। প্রথমত, সার্কের উদ্যোক্তা যেহেতু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, অতএব একে ধ্বংস কর। সার্ক থাকলে জিয়ার নামও থাকবে, এটা আওয়ামী লীগ সরকার সহ্য করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, সার্ক যদি শক্তিশালী থাকে, কিংবা সার্কের কাঠামো যদি জোরদার করে তোলা যায়, যদি এর ভেতরে আস্থা সৃষ্টি করা যায় তাহলে সার্ক কাঠামোর মধ্যে ভারতের প্রতিবেশী অন্য সকল রাষ্ট্রের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ভারতের স্বার্থের অনুকূল থাকে না। তারা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে। ফলে ভারত সার্কের ভেতরে আস্থার সংকট সৃষ্টি করতে চায়। বুঝে বা না বুঝে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী লীগ সরকার প্রথমে ধুয়া তুলেছিল উন্নয়ন চতুর্ভুজ নামক এক নষ্ট চেতনার। তাতে পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপকে বাদ দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে চতুর্ভুজ গড়ে তোলার প্রস্তাব করে বাংলাদেশ। বাদ পড়া তিনটি রাষ্ট্রই এই ধারার বিরোধিতা করে। ফলে সে উদ্যোগে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। যেখানে শত বাধা সত্ত্বেও নেপাল ও ভুটান ভারতের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তারা সার্ক চেতনাকে জোরদার করতে চাইছে, সেখানে আওয়ামী লীগ সরকার আত্মমর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভারতের পক্ষপুটে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। ওই চতুর্ভুজের উদ্যোগ কিছুটা ঝিমিয়ে আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার এবার উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ ত্রিভুজ গড়ে তোলার। এবার সংশয়-অবিশ্বাস-সন্দেহ সৃষ্টি হবে নেপাল-ভুটান-মালদ্বীপ-শ্রীলঙ্কার মধ্যে। আর অবিশ্বাস সৃষ্টির দায় নিতে হবে বাংলাদেশ সরকারকে।

www.pathagar.com

এদিকে মাত্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কষে গাল দিয়েছেন নওয়াজ শরীফ সরকারকে। কেন তিনি বিরোধী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সে দেশে আমন্ত্রণ জানালেন। এখন বাংলাদেশের আহ্বানে পাকিস্তান গাল হজম করে সাড়া দিলেও অবিশ্বাস-সংশয় পাকিস্তানেরও থাকবে এবং নিশ্চিত করে বলা যায়, এ উদ্যোগ ব্যর্থ হবে। কিন্তু এসব আয়োজন-সম্মেলন থেকে যা লাভ হবে, তা হল সার্কের ভেতরে সকল দেশের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সংশয় আর অবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। আর সেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে যাবে ভারত। আওয়ামী লীগ সরকার তার হুকুমবরদার মাত্র।

www.pathagar.com

রং ট্র্যাকে হিল ট্র্যাক্টস

আওয়ামী লীগ সরকার যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের মদদপুষ্ট সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে, সে বিষয়টি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের হোতা ভারতের প্রত্যক্ষ সমর্থনে গড়ে ওঠা তথাকথিত শান্তি বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব হত্যাকাণ্ড এতই লোমহর্ষক যে, তা ভিয়েতনাম যুদ্ধের মাইলাই হত্যাকাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের অখণ্ডতা নস্যাৎ করার জন্য ভারত ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবের শাসনামলেই এই শান্তি বাহিনী গঠন করে চাকমা উপজাতীয়দের নিয়ে। তাদের অবৈধ অস্ত্র দেয়, প্রশিক্ষণ দেয় এবং তারপর বাংলাদেশের ভেতরে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে মদদ জোগায়। এছাড়াও তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে ভারত।

এই শান্তি বাহিনী গত ২৪ বছরে সেখানে বসবাসকারী হাজার হাজার বাংলাদেশী মানুষকে হত্যা করেছে। কখনো নির্বিচারে গুলি চালিয়ে, কখনো জবাই করে, কখনো গ্রাম জুড়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে হাজার হাজার বাংলাদেশীকে। তাদের এই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পায়নি সদ্যজাত শিশু, রেহাই পায়নি বৃদ্ধ, রেহাই পায়নি নারীরাও। এ ছাড়াও তথাকথিত এই শান্তি বাহিনী উপজাতীয় এলাকায় হামলা চালিয়ে হাজার হাজার উপজাতীয় বাংলাদেশী নাগরিকদের স্বদেশ ভূমি থেকে উৎখাত করেছে। তাদের ভারতীয় স্মরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করেছে। ভারতীয় উদ্বাস্তু শিবির থেকে পালিয়ে আসা উপজাতীয় বাংলাদেশী নাগরিকরা সেখানকার বাসিন্দাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা জানিয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি বাহিনীকে মদদ দিয়ে ভারত সন্ত্রাসীদের এখনও লালন করে যাচ্ছে। অপর দিকে বাংলাদেশে ভারতীয় স্বাধীনতাকামীদের বাংলাদেশ আশ্রয়-প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বলে বাংলাদেশের ওপর উল্টো দোষারোপ করছে।

এরকম একটা অসম পরিস্থিতিতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের ইচ্ছানুযায়ী এই সন্ত্রাসী বাহিনীর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনা শুরু করেছে। সে আলোচনায় সন্ত্রাসের নায়কদের ভারতীয় এলাকা থেকে নিরাপদে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এনে তাদের আবার হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসছে এবং আলাপ আলোচনা সেরে তাদের আবার ভারতের প্রশিক্ষণ শিবিরে ফেরত যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এজন্য এদের কোন পাসপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হচ্ছে না। ভারত

www.pathagar.com

সরকারই বা কীভাবে পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়া এইসব সন্ত্রাসীদের অবাধে সে দেশে যাতায়াত করার সুযোগ দিচ্ছে তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে যা মারাত্মক এবং রহস্যজনক, তা হল সন্তু লারমা গং-এর সঙ্গে সরকার কী গোপন সলা-পরামর্শ করছে তার বিন্দু বিসর্গও জনগণকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। এ বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হচ্ছে না জাতীয় সংসদে, জানানো হচ্ছে না সাংবাদিকদের। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে, আলোচনায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হচ্ছে, শিগগীর চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এই সরকার দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন নিয়ে যে লুকোচুরি খেলছে তা দেশকে এক ভয়াবহ সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

সরকার মুখে নানা কথা বললেও ভারতীয় নীলনকশা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আমাদের স্বার্বভৌমত্ব প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত ও শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। শান্তি বাহিনীর ইচ্ছানুযায়ী সরকার কোন ঘোষণা ছাড়া সকলের অজ্ঞাতে সেখান থেকে সেনা সদস্যদের প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে। সেখানে বসবাসকারী বাঙালি পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে সেই ভিটায় উপজাতীয়দের ঠাঁই করে দিচ্ছে। সেখানে বাংলা ভাষাভাষী নাগরিকদের উচ্ছেদ করে একই বাস্তুভিটায় কেন উপজাতীয়দের পুনর্বাসন করতে হবে? কেন তাদের নতুন স্থানে বসতি স্থাপন করা যাবে না? কেন তারা তাদের পুরনো বাস ভবনে বসবাস করতে পারবে না? কেন পরিবার পরিজন নিয়ে বাঙালিদের এসে দাঁড়াতে হবে খোলা আকাশের নিচে? শান্তি বাহিনীর শর্ত পূরণের জন্যই কি সরকার এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালিদের উচ্ছেদ করছে? সরকার কি তবে চাইছে যে, শান্তি বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়ে তাদের হামলার শিকার হচ্ছে, তাদের বর্বরতায় ভীত হয়ে বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসুক?

সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনী শর্ত দিয়েছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে কেউ বসতি স্থাপন করতে পারবে না। সরকার এ শর্ত মেনে নিয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকদের যে-কোন এলাকায় বসিত স্থাপনের অধিকার রয়েছে। সরকার সে অধিকার অস্বীকার করছে। এভাবে নতুন কেউ বসতি স্থাপন না করলে এবং সেখানে বসবাসকারী বাঙালিদের মেরে তাড়িয়ে দিতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহজেই শান্তি বাহিনীর তথা ভারতের করতলগত হবে।

শান্তি বাহিনী শর্ত দিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ক্ষেত্রে শান্তি বাহিনীর কাছ থেকে পারমিট নেয়ার প্রয়োজন হবে। সরকার সে শর্তও মেনে নিয়েছে কিনা, জানা যায়নি। সরকার ও এ সকল ব্যাপারে গোপনীয়তা অবলম্বন করেছে। তাতে ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সরকার সন্ত্রাসীদের এই শর্তও মেনে নিয়েছে। এই পরমিটের সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায়, শান্তি বাহিনী ভিসা দিলেই কেবল অউপজাতীয় নাগরিকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ ছাড়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাই যদি সন্ত্রাসীদের হাতে ছেড়ে দেয়, তা হলে সরকারের সঙ্গে চুক্তি না হলেও সন্ত্রাসীরা পার্বত্য

www.pathagar.com

চট্টগ্রামগামী যে কোন নাগরিককে ধাওয়া দেবার ক্ষমতার অর্জন করবে এবং তাদের প্রকাশ্যে যানবাহন থেকে নামিয়ে নিরুদ্দেশের দিকে নিয়ে যেতে পারবে। তার অর্থ দাঁড়াবে সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনীকে গণহত্যার লাইসেন্স প্রদান।

কিন্তু সরকার কেন দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী এমন অপতৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে তাও রহস্যজনক। শ্রীলঙ্কায় তামিল বিদ্রোহীদের মদদ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সেখানে স্বাধীনতার ধুয়া তুলিয়ে দিয়েছিল ভারত। তামিল বিদ্রোহীদের সন্ত্রাসে জাফনা এলাকার নিয়ন্ত্রণ কলম্বো সরকারের হাত ছিল না। কলম্বো সরকার এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে ভারত তেড়ে মেরে এসেছে এবং সারা বিশ্বে হৈ হৈ রৈ রৈ রব তুলেছে। শেষে শ্রীলঙ্কায় ভারত জবরদস্তিমুলকভাবে সৈন্য পাঠিয়েছে। সে সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত তামিলদের হাতেই প্রাণ দিয়েছে এবং অঙ্গহানির শিকার হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। তামিল বিদ্রোহীদের হাতে ভারতের প্রায় ২০ হাজার সৈন্য প্রায় হারায় এবং এর প্রায় দ্বিগুণ সৈন্য পঙ্গু হয়। শেষ পর্যন্ত ভারত উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে শ্রীলঙ্কা থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়। পরে তামিলদের হাতেই নিহত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী। শ্রীলঙ্কার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা সরকার এখন সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে জাফনায় কেন্দ্রের প্রায় পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। এই সংঘর্ষে সরকারি সৈন্যদের প্রাণহানি ঘটলেও বিদ্রোহ প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এনেছে শ্রীলঙ্কান সরকার। কই এখন তো বিশ্বব্যাপী আর হৈ চৈ নেই। বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলোও এ ব্যাপারে নীরব। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই যে কোন মূল্যে নিজ ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অধিকার রয়েছে।

আমাদের প্রশ্ন, দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য শান্তি বাহিনীর খুনি সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন না করে সরকার কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে? সরকারের এই চক্রান্ত প্রতিহত করার জন্য এখনই সকল স্তরের দেশপ্রেমিক সচেতন নাগরিকদের একসঙ্গে রুখে দাঁড়াতে হবে। বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

কিন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির সহজ সমাধানের পথ বাদ দিয়ে ভুল পথে ঠেলে দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে, খুনি সন্ত্রাসীদের জামাই আদর ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে সেখান থেকে বাঙালিদের উৎখাতের ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে পুরো বিষয়টিকেই কৌশলগতভাবে বাংলাদেশের হাতের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। এই চক্রান্ত রুখতে হবে।

www.pathagar.com

শান্তিবাহিনী নরহত্যা করেই যাচ্ছে সরকার নীরব কেন?

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর ঘাতকেরা ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি পুনরায় চারজন মানুষ খুন করেছে। শান্তিবাহিনী গত ১৫ ফেব্রুয়ারি বান্দরবানে যে তিনজনকে খুন করেছে, তারা তিনজনই পুলিশ বাহিনীর সদস্য। পরের দিন তারা সেনাবাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে সেনাবাহিনীর একজন সদস্যকে হত্যা এবং অপর একজন সদস্যকে গুরুতরভাবে জখম করেছে। বান্দরবান জেলার রংছড়ি থানা সদরের কাছাকাছি পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা যখন টহল দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই খুব কাছ থেকে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এই পুলিশ দলের ওপর একটি গ্রেনেড চার্জ এবং ব্রাশ ফায়ার করে। এতে পুলিশ বাহিনীর তিনজন সদস্য নিহত হন। শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা পুলিশের তিনটি রাইফেল ১২০ রাউণ্ড গুলি ও তাদের জুতা-জামাও খুলে নিয়ে গেছে। তার পরদিন তারা আর একজন সেনা সদস্যকে হত্যা করে।

এই খুনী সন্ত্রাসী চক্র ভারতের প্রকাশ্য মদদে, অস্ত্রে, রসদে, আশ্রয়ে বলীয়ান হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষ হত্যার ধারা সব সময়ই জারি রেখেছে। সরকারের তরফ থেকে অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দিলে তা কার্যকর করা হচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে; অথচ শান্তিবাহিনীর এই গুপ্তঘাতকেরা অস্ত্রবিরতির ঘোষণা দিলেও কখনো তা মান্য করছে না। হত্যা করে চলেছে সাধারণ মানুষ ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের।

কিছুদিন আগে এই শান্তিবাহিনীর সদস্যরাই অপহরণ করে নিয়েছিল একজন টিএনওসহ ৮ ব্যক্তিকে। তাদের নিয়ে আটক করে রেখেছিল ভারতীয় সীমান্তের ভেতরে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ওই কর্মকর্তাকে উদ্ধার করার জন্য কোন রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। শান্তিবাহিনী টিএনওকে ছেড়ে দেবার বিনিময়ে মুক্তিপণ দাবি করেছিল। সরকার কোন কথা বলেনি। বলেনি যে, ওই কর্মকর্তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হচ্ছে, শান্তিবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে কোন হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেনি। এবং বলেওনি যে, শান্তিবাহিনীর এই গণহত্যা অভিযান দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর একটি মরণপণ দল নোম্যানস ল্যাণ্ডের কাছে শান্তিবাহিনীর দুর্গম ঘাঁটিতে দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহৃত টিএনওসহ ওই আট ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আনে। অপহৃত এই বাংলাদেশী

www.pathagar.com

নাগরিকদের উদ্ধার করে আনায় সরকার খুশি হল কি ব্যাজার হল, সে কথাও কেউ মুখ ফুটে বলেনি। অবশ্য সপ্তাহ তিনেক পরে এই অভিযানের জন্য সরকার সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

তবে সরকার গত মাসের শেষ সপ্তাহে শান্তিবাহিনীর একটি প্রতিনিধি দলকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে জামাই-আদরে রেখে আলোচনা করেছেন। তখন সরকারের প্রতিনিধি সাংবাদিকদের কাছে বলেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে, তারা একটি চুক্তির একেবারে কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছেন। পত্র-পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয় যে, কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত বাঙালিদের সেখান থেকে সরিয়ে আনার ব্যাপার ছাড়া আর সকল বিষয়ে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সরকার মুখ ফুটে আজ পর্যন্ত সুস্পষ্ট কিছু জানায়নি।

তবে কি শান্তিবাহিনীর অন্যসব দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে? তবে কি পার্বত্য চট্টগ্রামে যেতে বাংলাদেশীদের পারমিট তথা ভিসা নিয়েই যেতে হবে? তবে কি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শিগগিরই প্রত্যাহার করে আনা হবে সেনাবাহিনী? তবে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের নিজস্ব পুলিশ বাহিনীর দাবি মেনে নেয়া হয়েছে? মেনে নেয়া হয়েছে কি পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পদ শুধু পাহাড়িদের জন্য ব্যয় করার দাবি? এসব দাবি মেনে নেয়ার অর্থ পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। আওয়ামী লীগ সরকারকে দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার অধিকার দিল কে?

শান্তিবাহিনীকে নিয়ে বর্তমান সরকার যে লুকোচুরি খেললেন, তাও কম বিস্ময়কর নয়। শান্তিবাহিনীর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনার গোটা প্রক্রিয়ায় সরকার শান্তিবাহিনীর অব্যাহত হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলেননি। প্রশ্ন তোলেননি টিএনও অপহরণ সম্পর্কে। প্রশ্ন তোলেননি তাদের নৃশংস আচরণ সম্পর্কে। এমনকি শান্তিবাহিনীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। যেন ভাসুরের নাম নিতে নেই। শান্তিবাহিনী যেন গোটা দেশবাসীর ভাসুর। একইভাবে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নরঘাতক বাহিনীর সদস্যদের ঢাকায় এনে এমন জামাইআদর করা হল, যেন তারা নিজেরাই আর একটি সরকার। তারা কথাও বলেছে সেই টার্মে। এই ঘাতক বাহিনীর প্রতিনিধিদল নাকি সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে। যেন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সরকার প্রধান আর সন্তু লারমার জুম্মুল্যাণ্ডের (পার্বত্য চট্টগ্রাম) সরকার প্রধান। তবে ওই বৈঠকে কথা হয়েছিল অস্ত্র বিরতি চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার আলোচনা হবে।

সে অস্ত্রবিরতি কঠোরভাবে মেনে চলেছে সরকার। এই কয়দিনে পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ড ঘটলেও একটিও গুলি ছোঁড়েনি পুলিশ বা সেনাবাহিনীর সদস্যরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও জামাই-আদর পাওয়া শান্তিবাহিনী গুলি করে ফের হত্যা করল পুলিশ বাহিনীর তিনজন সদস্যকে?

এখন প্রশ্ন হল, শান্তিবাহিনীর এই হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন সরকার? নাকি এখনও টিএনও অপহরণ ঘটনার পরবর্তীকালের মত সরকার চুপ করে বসে থাকবেন নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত? এ ঘোষণায় জনমনে

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের উদ্রেক হচ্ছে, বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব কি সরকারের নয়?

শান্তিবাহিনীর অব্যাহত হত্যাযজ্ঞ, এইসব ঘটনা দেখেও সরকার যদি চুপ করে থাকেন, যদি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না নেন তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। এরপর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যদি শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ওপরই আত্মরক্ষার জন্য হামলা চালায় সংঘবদ্ধ সাধারণ মানুষ কিংবা পুলিশ, তখনও কি সরকার নির্বিকার থাকবেন? নাকি যারা হামলা চালাল, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন-এ প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়।

সরকার যদি শান্তিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে কোন ব্যাখ্যা দিতে না পারেন, তা হলে আত্মরক্ষার্থে সাধারণ মানুষ কোন পদক্ষেপ নিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন নৈতিক বল সরকারের থাকে না। তাতে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে এক হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টি হবে, প্রাণ যাবে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের।

সুতরাং সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা দেশের সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। সংঘাত বা সংঘর্ষের পথ স্থায়ী শান্তির পথ নয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘাতক সন্ত্রাসীদের উপলব্ধি করতে হবে যে, সমস্যার সমাধান হতে হবে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রেখেই। একথা তাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়ারও দরকার আছে।

অপরদিকে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে বলেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ আরও চলবে। এ বক্তব্য ভয়াবহ। প্রধানমন্ত্রী যদি জানেন যে আরও হত্যাযজ্ঞ চলবে তা হলে কী ব্যবস্থা তিনি নিতে যাচ্ছেন?

হিসাব নিলে দেখা যাবে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর সদস্য সংখ্যা কিছুতেই পাঁচ হাজারের বেশি হবে না। আমরা বিশ্বাস করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা উপজাতীয়দের বেশির ভাগ সদস্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতায় বিশ্বাসী। ভারতের মদদপুষ্ট বিপথগামীর সংখ্যা তাই নগণ্য। এদের সশস্ত্র ক্যাডারের সংখ্যা তাই কিছুতেই তিন হাজারের ওপরে হবে না। এই সংঘবদ্ধ সশস্ত্র তিন হাজার দুষ্কৃতকারীর কাছে ১২ কোটি মানুষকে পরাভব মানতে হবে, তাদের ঘাতক অস্ত্রের সামনে নির্বিবাদে মাথা পেতে দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে– তা কিছুতেই হতে পারে না। শ্রীলঙ্কা সরকার জাফনার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার স্বার্থেই। কই, পৃথিবীর কোথাও তো তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে না। শান্তিবাহিনী যদি তাদের এই নৃশংস কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আর জামাই আদরে যে কোন কাজ হয় না, সে কথা প্রমাণ আবার মিলেছে শান্তিবাহিনী বিনাকারণে হত্যা করেছে পুলিশ বাহিনীর তিন সদস্যকে ও একজন সেনা সদস্যকে। এই নরমেধযজ্ঞ আর চলতে দেয়া ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

ফটিকের এক বাঁও মেলেনি : দো বাঁও মেলে-এ-এ-নি

আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কাব্য এবং সঙ্গীত প্রিয় মানুষ। জনসভায়, সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় সংসদে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেছেন; গানের দু'এক ছত্র গেয়ে শুনিয়েছেন। জাতিসংঘে প্রদত্ত ভাষণেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে স্টাডি করেছেন বলেই মনে হয়। ফলে হামেশাই তিনি তার বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিরোধী দলে থাকার সময় মঞ্চেসুর করে একটি পপুলার গানের প্যারোডি গেয়েছিলেন। তখন বিএনপিকে ধাক্কা মেরে মেরে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তিনি গণতন্ত্র শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি গেয়েছিলেন, 'এই ধাক্কা ধাক্কা নয়, আরও ধাক্কা আছে। এই ধাক্কারে নিয়ে যাব সেই ধাক্কার কাছে।'

আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে যখন কবিতা আবৃত্তি করেন, গানের দু'এক ছত্র গেয়ে শোনান, তখন সমবেত দর্শক-শ্রোতারা চমৎকৃত হন। ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তির পর তিনি আবারও রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করেছিলেন দু'ছত্র কবিতা, "আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।"

সর্বশেষ সংগীতটি তিনি পরিবেশন করেছেন সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে। এই অধিবেশনে বিএনপি'র সংসদ সদস্যরা পানি চুক্তি নিয়ে নানা কথা বলেছিলেন। তারা বলেছেন, ভারতের সঙ্গে ওই পানি চুক্তির ফলে ভারতই লাভবান হয়েছে। বাংলাদেশের কোন লাভ হয়নি। তারা বলেছেন, চুক্তি অনুযায়ী পানি পাওয়া যায়নি। এমনকি গত বছর এই সময় যখন কোন চুক্তি ছিল না, তখন যতটুকু পানি পাওয়া গিয়েছিল, এখন ততটুকু পানিও পাওয়া যাচ্ছে না। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে পানি যে কখনও চুক্তি অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে না, সে কথা সংবাদপত্রেও হামেশা উল্লেখ করা হচ্ছে। আর ভারত বলছে যে, পানি চুক্তির ফলে তারা লাভবান হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলেছে কলকাতা বন্দরে আগের চেয়ে এখন পানি বেশি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ ন্যায্য হিস্যা তো দূরের কথা চুক্তি অনুযায়ীও পানি পাচ্ছে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোয়ালিশন সরকারের পানিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাকও ১৩ মার্চ জাতীয় সংসদে বলেছেন, চুক্তি অনুযায়ী যে সময়ে পানি আসার কথা ছিল ৩৫ হাজার ৬শ' কিউসেক। সে সময় পানি এসেছে ২৭ হাজার কিউসেক।

তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, অনেক কথা। বলেছেন, স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন

www.pathagar.com

করা হয়েছে, আইন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে। রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে কমিশন গঠন করা হয়েছে, নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আর একথাও তো ঠিক যে পানি পাওয়া যাক বা না যাক, পানি চুক্তি তো একটা পাওয়া গেছে। আর সে প্রাপ্তি এসেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে। তবু বিএনপি সদস্যরা জাতীয় সংসদে পানি নিয়ে যা কাণ্ড করলেন!

এতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু পানি চুক্তি কেন, অন্যান্য কমিশন-কমিটিও তো গঠিত হয়েছে। এখন না দিক যতদিন সময় লাগে লাগুক, কমিটি-কমিশন কোন একদিন তো রিপোর্ট দেবে। সে রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হবে। সুবিধাজনক হলে বাস্তবায়িত হবে। তা নিয়ে এত হল্লা-চিল্লা কেন করছে বিরোধী দলের সদস্যরা-সেটা বোঝা তো মুশকিল হবারই কথা!

তাই প্রধানমন্ত্রী ১২ মার্চ জাতীয় সংসদে তার সমাপনী ভাষণে বলেছেন, আমরাই দীর্ঘদিনের পানি সমস্যার সমাধান করেছি। অথচ বিরোধী দল স্থানে স্থানে বাঁশ ফেলে বলছেন 'এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে-এ-এ না'। তারা বলছেন, হিসাব মিলছে না। এইখানে সুরারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তার কণ্ঠস্বরে। চমৎকার সুর দিয়ে গেয়েছেন 'এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে-এ-এ না।'

আমরা আগেই বলেছি, প্রধানমন্ত্রী সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন এবং রবীন্দ্র সাহিত্য চমৎকার হেফজো করেছেন। তিনি এই গানের কলিটি গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্প থেকে। এই ছোটগল্পে বিশ্বম্ভর বাবু পল্লী গ্রামের দুরন্ত ভাগনে ফটিককে লেখাপড়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। সেখানে সে পরিবেশে, স্কুলে কোথায়ও খাপ খাওয়াতে পারেনি ফটিক। আদরও পায়নি মামীর। ফলে ফটিক সর্বদাই শঙ্কিত থাকত। একদিন তার জ্বর হল। মামীর কষ্ট হবে চিন্তা করে ফটিক ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে তার মায়ের কাছে রওনা হয় পালিয়ে। কারণ মামা বলেছিলেন, ছুটি হলে তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু পালিয়ে গিয়ে রেহাই পায়নি ফটিক। পুলিশ তাকে ধরে এনে তার মামার বাড়িতে পৌঁছে দিল। ফটিক তখন বেঘোরে। তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে উঠল। পিতৃহীন ফটিকের মাকে আনতে পাঠানো হল গ্রামের বাড়িতে।

এই গল্পেরই শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন : "বিশ্বম্ভর বাবু স্তিমিত প্রদীপে রোগ শয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তে ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফটিক খালাসিদের মত সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, 'এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে-এ-এ না। কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণ স্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথায়ও তাহার তল পাইতেছে না।"

বিএনপি'র সংসদ সদস্যরা সঙ্গত কারণে দেশের স্বার্থেই বাঁশ ফেলিয়া 'জল মাপিতেছেন।' কারণ তা না হলে দেশ চড়ায় আটকা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী 'এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে-এ-এ-না' গানটি আওড়ে আওড়ে আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

www.pathagar.com

ভারতের দাদাগিরি

ভারতের একজন রণকৌশলবিদ সম্প্রতি কলকাতার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় এক নিবন্ধ লিখে বলেছেন যে, বাংলাদেশের কার্যত কোন অস্ত্রশস্ত্রেরই প্রয়োজন নেই। আর 'আদৌ যদি অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন থেকেই থাকে, তাহলে তা ভারত থেকে কিনে নিলে বাংলাদেশের নতুন সরকার দু'দেশেরই স্বার্থে উভয়ের সম্পর্ককে জোরদার করতে পারতেন। ওই নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের খুঁটিনাটি নিয়ে ভারতের শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু বাংলাদেশ চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করবে আর ভারত নীরবে তা দেখে যাবে, সেটা হতে পারে না।' তিনি লিখেছেন, 'চীনের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এ অঞ্চলের নিরাপত্তা ও ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করছে।' তাছাড়া চীন বাংলাদেশে প্রধান অস্ত্র রফতানিকারক দেশ হিসেবে বাণিজ্য ভারসাম্যে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী কিংবা চাহিদা নেই এমন অস্ত্রশস্ত্র চাপিয়ে দিতে পারলে ভারত বিপুলভাবে লাভবান হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেই ভারত সরকার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য তাদের বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবীদের মোতায়েন করেছে।

ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ১৯৯৭ সালের ১৮ মার্চ। এই চুক্তি নবায়ন না করার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে প্রতিশ্রুতি যে আওয়ামী লীগ রাখবেই এমন কোন কথা নেই। তা না হলে অতীতের সকল ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আওয়ামী লীগ এখন জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠত না।

আওয়ামী লীগ যদি ২৫ বছরের গোলামি চুক্তি নবায়ন না-ও করে তাহলেও ভারতের স্বার্থেই আওয়ামী লীগকে ট্রানজিট অথবা ভিন্ন নামে ভিন্ন কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। যা ভারতের 'এক্সটেনডেড ফ্রন্টিয়ার পলিসি'র অনুকূল থাকবে।

এ ধরনের একটি চুক্তি যে আওয়ামী লীগ করবেই, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি জাতিসংঘে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে গঙ্গার পানি সংক্রান্ত বক্তব্যের সংযোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে। ভারতের কাছে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। ঢাকায় শেখ হাসিনা যখন এই ভাষণ অনুমোদন করেন তখন সেখানে গঙ্গার পানি সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না। অথচ ভারত গঙ্গার পানি অন্যায়ভাবে প্রত্যাহার করে নেবার ফলে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল এবং প্রায় চার কোটি মানুষ মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

www.pathagar.com

ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত পরিবেশগত ভারসাম্য। নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনে তার ভাষণের দিন কোনো শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথায় সেখানে যুক্ত করা হয়েছিল একটিমাত্র বাক্য—"গঙ্গার পানি সম্পদসহ সকল আঞ্চলিক সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে।" কিন্তু কার চাপে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জীবন-মরণ এই পানি সমস্যার ব্যাপারে একটি বাক্যও স্থান পেল না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে? কোনো 'বন্ধুরাষ্ট্র' কি তাকে এই বাক্যটি বাদ দিতে বলেছিল? না কি তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাক্যটি বাদ দেয়ার। যেভাবেই হোক, এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এদেশের ১২ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেই পদদলিত করেছেন। দেশের স্বার্থের চেয়ে, জনগণের স্বার্থের চেয়ে তার কাছে কি তবে ভিন্ন কিছু বড় হয়ে উঠল?

এ ঘটনা প্রমাণ করে বর্তমান আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারকে ভারতের শর্ত অনুযায়ীই তার নীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং ভিন্ন নামে হোক, ট্রানজিটের নামে হোক ভারতের স্বার্থের অনুকূলে ভারতের সঙ্গে তাকে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। সে চুক্তি অনুযায়ী যাবতীয় সমরাস্ত্র কিনতে হবে ভারত থেকে। বাংলাদেশের বন্দর নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে ভারত যে বলে কিংবা কৌশলে কাজটি সম্পন্ন করে তার উদাহরণও রয়েছে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সালেই উল্লেখ করেছিলেন যে, ভারত ও শ্রীলংকার জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ভারতীয় ফেডারেশেনে শ্রীলংকার অন্তর্ভুক্তির সমর্থক। (W. G. Wriggins, Ceylon Dilemma of A new Nation, 1960, P. 399)। শুধু তাই নয়, নেহরুর নাতি রাজীব গান্ধী ১৯৮৭ সালের ২৯ জুলাই শ্রীলংকাকে যে চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন তাতে ছিল, "Trinkomalee or any other ports in Sri Lanka will not be made available for military use by anycountry in a manner prejudicial to Indian interests." এই চুক্তির শর্তে আরও ছিল India will Provide Training facilities and military supplies for Sri Lankan forces (Dr. Rezwan Siddiqui, Cultural colonization : India Bangladesh Issue, 1995, P. 46)। অর্থাৎ শ্রীলংকার বন্দরসমূহ ভারতের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়, এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না এবং শ্রীলংকার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দান এবং সকল ধরনের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে ভারত।

শ্রীলংকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুনিয়াস জয়বর্ধনে এ ধরনের একটি অসম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়েছিলেন। একইভাবে চীন থেকে অস্ত্র কেনার চুক্তি করায় ভারত নেপালকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিল। বাংলাদেশে আওয়ামী কোয়ালিশন সরকার এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেন তা দেখবার বিষয়। তবে বাংলাদেশ সরকার যাতে একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করে, সে জন্য ইতিমধ্যেই ভারতীয় সমর বিশারদ ও বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ভারত কি বাংলাদেশকে তার নিজ ভূখণ্ড ভাবতে শুরু করেছে?

ভারতের নিম্নমানের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ সরকার যে লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তির মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়েছে, তারা যে নির্লজ্জভাবে ভারতের পায়রোবি করছে, দেশের সীমান্ত এলাকার জনগণ তা এখনও টের পায়নি। সীমান্ত এলাকার স্বাধীনচেতা মানুষ এখনও সীমানা-পিলারকে সীমান্ত ধরে, পিলারের ভেতরের অংশকে নিজের স্বদেশ বলে জ্ঞান করছে। সেখানে যাচ্ছে ধান বুনতে, ধান কাটতে, সেখানে যাচ্ছে গরু চরাতে। কিংবা যেখানে সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে নদীর স্রোতধারার মাঝামাঝি সেখানে যাচ্ছে গোসল করতে বা মাছ ধরতে কিংবা পানি আনতে। এতে আওয়ামী লীগের প্রভু সরকারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী দারুণ রাগ। ফলে তারা যখন তখন বাংলাদেশী নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করছে, যখন তখন নাগরিকদের বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে ঢুকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। লোকজন মারতে-ধরতে না পারলে নিয়ে যাচ্ছে গবাদি পশু।

এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। কিন্তু সরকার নির্বিকার। নিশ্চল নির্বাক পাথরের মূর্তির মত কটা চোখে তাকিয়ে আছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর এই উস্কানিমূলক ও জবরদস্তিমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১২ মে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার আগে ১০ মে বিএসএফ দু'দফায় বাংলাদেশের দু'জন জেলে ও দু'জন কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই দিন ভোরে জকিগঞ্জ থানার মানিকপুর সীমান্তের কুশিয়ারায় জাল দিয়ে মাছ ধরছিলেন বাংলাদেশের দু'জন নাগরিক। সে সময় একদল বিএসএফ সমসু মিয়া ও লুদর আলী নামের ওই দুই বাংলাদেশীকে জাল ও নৌকাসহ জোরকরে অপহরণ করে নিয়ে যায়। একই দিন বিকালে গোয়াইনঘাট সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের ভেতরে মাঠে কাজ করার সময় বিএসএফ আরও দু'জন বাংলাদেশীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিডিআর কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু ওই চারজন বাংলাদেশীকে ওই খবর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিএসএফ ফেরত দেয়নি। ওই চারজন হতভাগ্য বাংলাদেশীর ভাগ্যে কী ঘটেছে জানা যায়নি। হয়ত ভারতীয়রা তাদের হত্যা করে পুড়িয়ে ফেলেছে।

দৈনিক ইত্তেফাকেই ১৩ মে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে সিলেট সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর উস্কানিমূলক তৎপরতা অব্যাহত আছে। ১১ মে তারা গোয়াইনঘাট থানার প্রতাপপুর সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশী কৃষকদের

www.pathagar.com

৩৬টি গরু জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সীমান্তের ১২৭০ নং পিলারের কাছে কৃষকরা যখন গরু চরাচ্ছিল তখন একদল বিএসএফ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে গরুগুলো ছিনিয়ে নেয়। নাগরিকরা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসেন। সীমান্ত এলাকায় তাই চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এ ধরনের ঘটনা আকসার ঘটছে।

এর মধ্যে ঘটেছে আরও দুটি মারাত্মক ঘটনা। ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর হেলিকপ্টার দু' দু'বার শুধু বাংলাদেশের আকাশসীমাই লঙ্ঘন করেনি, এর মধ্যে একবার ভারতীয় একটি হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের ভেতরে অবতরণ পর্যন্ত করেছে। তারপর সেই হেলিকপ্টার থেকে ভারতীয় সেনাসদস্যরা এলাকায় নেমে হাঁটাচলা করেছে, নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছে, লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা পর্যন্ত বলেছে। তারপর সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়তে থাকলে তারা আবার হেলিকপ্টার উড়িয়ে ভারতে চলে গেছে। এরপর আরও এক দফায় ভারতীয় সামরিকি হেলিকপ্টার বাংলাদেশের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে নানা এলাকা পর্যবেক্ষণ করেছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের একটি নিজস্ব সরকার রয়েছে। সে সরকারের একটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েছে। সে মন্ত্রণালয়ের একজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ও আর একজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। কই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এই ঘটনার কোন প্রতিবাদ কেন জানানো হচ্ছে না? কেন সীমান্তে ক্রমশ বিএসএফ-এর নাশকতামূলক তৎপরতা, বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হামলা, বাংলাদেশের গবাদি পশু লুটের বিরুদ্ধে সরকার টু শব্দটি পর্যন্ত করছে না?

ভারত এখন বাংলাদেশকে একটি উপনিবেশ হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপনিবেশিক প্রভুর মত যখন তখন ঢুকে পড়ছে, যাকে খুশি গ্রেফতার করছে, বাংলাদেশের নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, আর সরকার উপনিবেশবাদীদের তাঁবেদারের মত নিশ্চুপ বসে আছে। এই পরিস্থিতি দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি সুস্পষ্ট হুমকি হলেও তাঁবেদার সরকার গদি আঁকড়ে বসে আছে। পরিস্থিতি এমন যে, যেন ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যা খুশি করুক, সরকার ক্ষমতায় থাকলেই হয়। যেন জনগণ নয় ভারতকে খুশি রেখে, ভারতের আগ্রাসী তৎপরতাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়ে সরকার ক্ষমতায় থাকতে চাইছে।

হ্যাঁ, ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তারা রাখঢাক করেননি। তারা বলেছেন, বাংলাদেশে এখন তাদের সবচেয়ে অনুকূল ও প্রিয়ভাজন সহযোগিতামূলক সরকার রয়েছে। বাংলাদেশের ভেতরে সামরিক ও গোয়েন্দা তৎপরতা চালাতে এখন আর কোন বাধা নেই। বাংলাদেশের ভেতর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা অফিস খুলেছে। তাদের চর নিয়োগ করছে, তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যেন বাংলাদেশ ভারতীয় সার্বভৌমত্বের অধীন, তাঁর নিজের কোন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ বারবার প্রমাণ করেছেন, তারা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। হাজার বছর ধরে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের মানুষ নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য লড়াই করেছে। তারাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে; সেই স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের জন্যও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে জনগণ প্রস্তুত আছে।

ক্ষমতার মসনদে বসে যদি আওয়ামী লীগ সরকার বেগুনে লবণ দেয়ার তত্ত্ব জাহির করতে থাকেন, যদি বলেন রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়েছি, তার মাধ্যমে দেশের কি করব, কার সঙ্গে চুক্তি করব, কার কাছে বিকিয়ে দেব, কাকে ইজারা দেব, সে অধিকার আমার। তা হলে তারা বড় ভুল করবেন। কারণ দেশের মালিক জনগণ, কোন তাঁবেদার গোষ্ঠী নয়।

আমরা মনে করি, এখনও সময় আছে। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছে, যেভাবে বাংলাদেশকে তার নিজ ভূ-খণ্ড ভাবতে শুরু করেছে। সরকারের তরফ থেকে তাঁর প্রতিবাদ করতে হবে। প্রয়োজনে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরকার সে দায়িত্ব পালন না করলে বিরোধী দলগুলো কি চুপ করে বসে থাকবে? তাদেরও কি কিছু করণীয় নেই?

www.pathagar.com

পরাধীনতার দিকে

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ধিকৃত স্বৈরশাসক এরশাদের জাতীয় পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনে সরকার গঠন করেছে ২১ মাস আগে। এই একুশ মাসে ভারতের নীলনকশা অনুযায়ী বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এখন বিপন্ন, দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পরাধীনতার দিকে।

প্রাথমিকভাবে, আওয়ামী লীগের মধ্যকার ষড়যন্ত্রকারীরা বাদে অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় নেতা এবং তরুণ আওয়ামী লীগাররা একথা বিশ্বাসও করতে পারবেন না যে, দেশ সত্যি সত্যি পরাধীনতার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বিশ্বাস করি যে, আওয়ামী লীগ সমর্থক সকল লোকই দেশদ্রোহী কিংবা দেশকে ভারতের হাতে তুলে দিতে চায় না। বরং আমরা মনে করি, আসন্ন দুর্দিনে প্রয়োজনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেও প্রস্তুত আছেন বহু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী। কিন্তু ষড়যন্ত্র হচ্ছে শীর্ষ পর্যায় থেকে।

এই উপমহাদেশে স্বাধীন দেশের পরাধীন হয়ে যাবার ঘটনা আগেও ঘটেছে। আর স্বাধীন দেশকে যুদ্ধ ছাড়াই আধুনিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রক্রিয়ায় দখল করে নিয়েছে ভারত। ভারতই এ অঞ্চলে স্বাধীনতা হরণকারী। এমন কি ভারত নিজে স্বাধীন হবার আগেই শ্রীলঙ্কা দখল করে নেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু। তিনি বলেছিলেন, শ্রীলঙ্কার নিজের স্বার্থে এবং ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে শ্রীলঙ্কাকে ভারতের ডোমিনিয়নভুক্ত থাকতে হবে। বিষয়টি নিয়ে নেহেরু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার অবিসংবাদিত নেতা বন্দরনায়েক সেই প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ভারত বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ডাক দেন। এ ক্ষেত্রে শুরু থেকেই বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সংঘাতমূলক পরিস্থিতি এড়াতে নেহেরুকে সে খায়েস তখন ছেড়ে দিতে হয়।

তবে নেহেরুর রাষ্ট্র গ্রাসের লোভ কখনও প্রশমিত হয়নি। নেহেরুর শাসনামলেই প্রশাসনকে তিনি এমনভাবে ঢেলে সাজান, রাজনীতিকদের মধ্যে রাষ্ট্র গ্রাসের লোভ এমনভাবে বিস্তার করেন যে, ভারতীয় আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাও স্বাধীন রাষ্ট্র গ্রাসের লোভ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

ভারত এই উপমহাদেশে প্রথম যে স্বাধীন রাষ্ট্রটি ভারতের অধীনে নিয়ে নেয়, সেটি হল মনিপুর। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের কাছ থেকে মনিপুর স্বাধীনতা লাভ

www.pathagar.com

করে ভারতের সঙ্গেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। স্বাধীনতা লাভের পর মনিপুরের রাজা দেশটিকে গণতন্ত্রে রূপান্তর করে সকল ক্ষমতা ছেড়ে দেন। তিনি শুধু নামমাত্র রাজা থাকেন। কিন্তু ১৯৪৬ সাল থেকেই জওহরলাল নেহেরু গং মনিপুরে ভারতীয় চরের অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকেন এবং সেখানে ভারতীয় দালাল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন লোকদের নগদ উৎকোচ বা অন্য কোনভাবে কিনতে শুরু করেন। কিন্তু মনিপুরে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিকাশের ধারা অব্যাহত থাকে। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে মনিপুরে নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনের আগেই মনিপুর জাতীয় সংসদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের ঘুষ দিয়ে ভারতের অনুকূলে কাজ করানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাতে ভারতের তাঁবেদ্বার কয়েকজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ সেই কয়েকজন ভারতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করে পাস পাস বলে চিৎকার করে। ততক্ষণে ভারতীয় সেনাবাহিনী মনিপুর দখল করে নেয়। ভারত তার প্রতিবেশীদের প্রতি এই মনোভাব ত্যাগ করেনি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় ঢাকায় ভুটানের দূতাবাস স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ভুটান তার সার্বভৌমত্ব যেটুকু ছিল সেটুকু রক্ষা করতে পেরেছে। উপমহাদেশে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সার্বভৌম মর্যাদা যে ভারত সহ্য করতে পারছে না, তার প্রমাণ আছে ভুরিভুরি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে মনিপুর, সিকিম, ভুটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক বড়। জনসংখ্যাও ওই সকল রাষ্ট্রের মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। সে কারণে বাংলাদেশের ভারত সিকিমির কৌশল অবলম্বন করেছে বেশি করে। আওয়ামী লীগকে ভারত সিকিম কংগ্রেসের মত মদত দিয়ে, কৌশল দিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী করেছে। ১৯৯১ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন যে, তারা আওয়ামী লীগের বিজয়ের জন্য ৪০০ কোটি ভারতীয় রূপী (তৎকালে ৬০০ কোটি বাংলাদেশী টাকা) খরচ করেছিল। কিন্তু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হতে পারল না। তাই ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'। এবং এ যাত্রা তারা সফল হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং) পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে গ্রাস করার ষড়যন্ত্র এখন পরিপক্ক রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-কারখানা-অর্থনীতি ধ্বংসের জন্য নীলনকশা অনুযায়ী অনুগত হাসিনা সরকার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর ফলে এফবিসিসিআই জানিয়েছে, আওয়ামী সরকারের ২০ মাসের শাসনকালেই ৫০০০ শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, আরও শত শত কারখানা বন্ধ হবার পথে। দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সরকার নির্বিকার চিত্তে শুধু দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ আছেন। আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস হলে মানুষ রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। সেটাই চাইছে 'র' ও সরকার। সে প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ যেহেতু উপরিউল্লিখিত দেশগুলোর চেয়ে আয়তনে বড় সে কারণে এর এক-দশমাংশ ইতিমধ্যেই শান্তিবাহিনীর নামে ভারতের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেছে সরকার। পানি চুক্তির নামে সকল পানি ভারতের হাতে তুলে দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়ে মানুষকে সর্বস্বান্ত করার ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। দেশের খনিজ সম্পদ ভারতের হাতে তুলে দিয়ে দেশকে নিঃস্ব করে ফেলার চক্রান্ত করছে সরকার। যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের প্রতি সাধারণ মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেই সুযোগে তথাকথিত সম্পদশালী ভারতের সঙ্গে মিলে যাবার প্রস্তাব উত্থাপন করে একদিন পার্লামেন্টে আইন করে স্বাধীন বাংলাদেশকে যে পরাধীন করা হবে না-তার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকের বসতি স্থাপন : বেহাত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম

নিবন্ধে ভারত কর্তৃক দখলকৃত মণিপুর ও সিকিমের উদাহরণ টেনে বলেছি, "বাংলাদেশ যেহেতু উপরিউল্লিখিত দেশগুলোর চেয়ে আকৃতিতে বড় সে কারণে এর এক-দশমাংশ ইতোমধ্যেই শান্তিবাহিনীর নামে ভারতের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করেছে সরকার।" এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত একমাত্র দৈনিক দিনকাল পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। সে রিপোর্টে বলা হয়েছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় শত শত ভারতীয় পরিবার এসে এখন স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছে। তখন ঢাকায় সরকারি ঢাকবাদক তাঁবেদার পত্র-পত্রিকা একেবারে চুপ মেরে ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এমন আকার ধারণ করেছে যে, সরকারি তাঁবেদার পত্র-পত্রিকাগুলোও এখন আর সে সব কথা লুকিয়ে রাখতে পারছে না, মিনমিন করে হলেও প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে।

২৯ মার্চের দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত সর্বশেষ রিপোর্ট থেকে জানা গেল শত শত নয়, হাজার হাজার ভারতীয় পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকার বিরান ভূমিতে ঘরবাড়ি তুলে বসবাস শুরু করেছে। তাদের আশ্রয় দিচ্ছে ভারত থেকে সদ্য প্রত্যাবাসিত উপজাতীয় শরণার্থীরা।

উপজাতীয় শরণার্থীদের ছদ্মাবরণে প্রত্যাবাসনের সময়ই বহু ভারতীয় নাগরিক ও পরিবার বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। তারা সরকারের দেয়া ৫০ হাজার করে টাকা ও দু'একর জমির মালিকানা লাভ করে। তারপর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মিলে তাদের প্রায় প্রত্যেকেই নগদ দুই লাখ টাকা হাতে পায়। সেই টাকা দিয়ে ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে জায়গা-জমি ও সম্পদের মালিক হয়েছে। বসতবাড়ি তুলেছে। আর সেখানে এসে এখন আশ্রয় গ্রহণ করছে হাজার হাজার ভারতীয় পরিবার।

ভারতীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে গত ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগ সরকার যখন তথাকথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে, তখনই আমরা বলেছিলাম, এই চুক্তির বলে ভারত বিপুল খনিজ ও বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নিতে চায়। ওই অঞ্চলের ওপর বাংলাদেশ তার সার্বভৌমত্ব হারাতে পারে। তখন সরকারের শীর্ষ মহল থেকে তাদের স্যাঙ্গাৎরা পর্যন্ত একযোগে এর প্রতিবাদে শোর তুলেছিলেন। এখনও সে মিথ্যাচার চালিয়ে যেতে কসুর করছেন না। কারণ তারা

www.pathagar.com

দেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে জেনে-শুনেই এই ষড়যন্ত্র করেছেন। আর চোরের মায়ের গলা সব সময়ই বড় থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই যে ওই চুক্তি করা হয়েছে, সম্প্রতি বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলে ভারতীয়দের অবাধ অনুপ্রবেশ ও বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ঢাকার আওয়ামী লীগ সরকার যে কিছুই করতে চান না, বান্দরবানের জেলা প্রশাসকের কথার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়েছে। জেলা প্রশাসক বলেছেন, এই অনুপ্রবেশ সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। অনুপ্রবেশকারীরা বলেছেন, তারা গত কয়েক বছরের গোলযোগের সময় ভারতে যাননি, তারা গিয়েছেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ফলে তারা বাংলাদেশের নাগরিক। আর এ কারণেই শরণার্থী তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জেলা প্রশাসক বলেছেন, তিনি পুরানো ভোটার তালিকা খুঁজছেন।

এই অনুপ্রবেশের সুযোগ যে দেশের অখণ্ডতাবিরোধী সরকারই করে দিয়েছেন, তথাকথিত শান্তি চুক্তির ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। সেই কালো চুক্তির শর্তে বলা হয়েছে, চুক্তি সম্পাদনের পর ঢাকার আ'লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে এনে সেনানিবাসে আবদ্ধ করে রাখবেন। সে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেনাবাহিনী পুলিশ বিডিআর-এর সীমান্ত চৌকি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের পার্বত্য সীমান্ত এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। আর তাই শেখ মুজিবের শাসনকালের পরে কোন দিন যা ঘটেনি, বাংলাদেশ ভূখণ্ডে তাই ঘটেছে। ভারত তার নাগরিকদের বাংলাদেশে হাজারে হাজারে পাঠিয়ে বাংলাদেশের ভূমি-জমি দখল করে নিচ্ছে। আর এই রাষ্ট্র ধ্বংসী প্রক্রিয়ায় অর্থ সাহায্য করছে সরকার নিজে।

তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি অনুসারে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী কে বাংলাদেশের নাগরিক এবং কে বাংলাদেশের নাগরিক নয় তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে শান্তিবাহিনীর ওপর। এই শান্তিবাহিনী ভারতের সৃষ্ট, ভারতের মদতপুষ্ট, ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ভারতে বসবাসকারী সন্ত্রাসী বাহিনী। ওখানে বসবাসরত অউপজাতীয় বাংলাদেশীরা নাগরিক যে নয় সে সার্টিফিকেট সহজেই দেবে। এবং তারা যে অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিকদেরও নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট দেবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিকরা প্রথম সুযোগেই বাংলাদেশ কিংবা বলা যায়, গঠিতব্য ভারতীয় রাজ্য জুম্মল্যান্ডের নাগরিকত্ব লাভ করবে।

কালো চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে পুলিশ বাহিনী গঠিত হবে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের দিয়ে। তাদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে কোনদিন যে ভারতে পুশব্যাক করা যাবে না, সে কথা দুগ্ধপোষ্য শিশুও অনুধাবন করবে।

ইতিমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা সেখানে বসবাসরত অউপজাতীয় বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর ব্যাপক হারে চাঁদাবাজি করছে, তাদের নির্বিচারে হত্যা করছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, জমিজমা

www.pathagar.com

দখল করে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকার শান্তিবাহিনীকে সশস্ত্র করে অসহায় বাংলাভাষাভাষী নাগরিকদের বিতাড়নের পথ প্রশস্ত করেছে। ধারণা করা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি নিধন প্রক্রিয়া শীগগীরই জোরদার হবে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশী বাংলাভাষীদের চলে আসতে বাধ্য করা হবে। বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিতাড়নের পর কার্যত স্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের তাঁবেদার রাষ্ট্র হিসেবে কিংবা ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। এতদিনে আরও কয়েক লক্ষ ভারতীয় উপজাতীয় নাগরিক ওই এলাকায় বসতি স্থাপন করে ভারতের দখলের পথ সুগম করে দেবে।

বাংলাদেশের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য দুর্বার আন্দোলন এখনই গড়ে তোলা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

নিলামে বাংলাদেশ

শাসক দল আওয়ামী লীগ গোটা বাংলাদেশকেই এখন নিলামে তুলেছে। বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ নিয়ে সরকার হরির লুটের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। একদিকে পার্বত্য চুক্তির নামে সরকার দেশের সম্পদ সমৃদ্ধ এক-দশমাংশ এলাকা যেমন ভারতের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে, অপর দিকে দেশের তেল-গ্যাস সম্পদ বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে দেশকে দেউলিয়া বানাবার পাঁয়তারা করছে। কিন্তু দেশের এত বড় স্বার্থ হানিকর ঘটনার কোন কিছুই সরকার দেশবাসীকে জানতে দিচ্ছে না। এ নিয়ে জাতীয় সংসদেও বিরোধী দলকে কোন কথা বলতে দিচ্ছে না। অপর দিকে তেল-গ্যাসের চুক্তি নিয়েও শাসক দল এমন সব কাণ্ড করছে, যাতে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। তেল-গ্যাসের চুক্তি নিয়ে বিশ্বের বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি মিলিত হয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছতা কমিশন গঠন করেছে। তারা অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশের তেল-গ্যাস উত্তোলনের টেন্ডার পেতে মন্ত্রী-মিনিস্টার থেকে পিয়ন দারোয়ান পর্যন্ত সকলকেই ঘুষ দিতে হয়। এ ব্যাপারে কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের অভিযোগ জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ পরবর্তীকালে বলেছেন, তাদের অভিযোগের সামান্য অংশও যদি সত্য হয়, তাও দেশের জন্য ভয়াবহ দুঃসংবাদ।

সরকারও কোলাহল করে বলতে শুরু করেছে যে, বাংলাদেশ তেল-গ্যাসের ওপর ভাসছে। আর সরকার সমর্থক ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোন কোন সংবাদপত্রও ঢেরা পিটিয়ে একই কথা বলছে। কেউ কেউ এমনও আজগুবি তথ্য দিচ্ছে যে, পৃথিবীর গ্যাস সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে। এই সকল প্রচার প্রপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য জনগণকে বিভ্রান্ত করে দেশের গ্যাস সম্পদ অপরের হাতে তুলে দেয়া। দেশকে দ্রুত ফতুর করে দেয়া। শাসক দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি যেভাবে জেঁকে বসেছে তাতে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই সম্পদ বিক্রির অর্থে দেশ ও জনগণ কিছুতেই লাভবান হবে না। দুর্নীতির পাইপ লাইনের মাধ্যমে তা বিদেশে পাচার হয়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বহু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দেশ তেল-গ্যাসের নিজস্ব রিজার্ভে হাত না দিয়ে তেল কিনে ব্যবহার করছে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই পৃথিবীর দেশসমূহ এ ব্যবস্থা নিয়েছে।

বাংলাদেশে তেল এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু তার সম্ভাবনা নেই, সে কথা কেউ বলেনি। তবে যে গ্যাস পাওয়া গেছে তাতে বাংলাদেশের প্রয়োজনের ২০

www.pathagar.com

বছরও চলবে কি না, সন্দেহ আছে। সে রকম একটি পরিস্থিতিতে গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপনের দিকে না গিয়ে শাসক দল আওয়ামী লীগ কেন দেশের এই মূল্যবান সম্পদ দ্রুত বিক্রি করে দিয়ে নিঃশেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে তাও ভেবে দেখতে হবে। বাংলাদেশে মজুত গ্যাস দিয়ে কল-কারখানা যেমনচলতে পারে, তেমনি উৎপাদিত হতে পারে বিদ্যুৎ, সার প্রভৃতি। কিন্তু সরকার সে দিকে না গিয়ে এই সম্পদে ভারতকে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশের গ্যাস ভারতে পাঠালে ভারতের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তারা এই গ্যাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, আর বাংলাদেশ উচ্চ মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রায় সে বিদ্যুৎ কিনে আনবে। এমন আত্মঘাতী দেশবিরোধী চুক্তি শাসক দল কার স্বার্থে করছে, সেটা এখন আর অস্পষ্ট নেই।

এদিকে তেল গ্যাসের চুক্তি নিয়েও সরকার গোটা দেশকেই এখন নিলামে তুলেছে। এ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও এখন কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ দ্রুত তুলে বিক্রির করার এই আয়োজনে সরকার এমন সব অখ্যাত কোম্পানিকে আনুকূল্য দিচ্ছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, এর পেছনেও দুর্নীতি কাজ করছে। সে সম্পর্কে সরকার এমনই বেপরোয়া যে, জনগণকে কিছু জানতেও দিচ্ছে না। সরকারের আচরণে এটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা সকল দিক থেকেই দেশকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। অবস্থাটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, যে দেশে তার পিতৃহত্যার প্রতিবাদ হয়নি, সে দেশের অস্তিত্ব থাকারই কোন প্রয়োজন নেই।

সরকার গোটা দেশের মানুষের মতামত উপেক্ষা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতের মদতপুষ্ট কিছু সংখ্যক সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে আইন করে তুলে দিচ্ছে দেশের এক-দশমাংশ এলাকা। সন্ত্রাসী গ্রুপের হাতে এই এলাকা তুলে দেয়ার অর্থ তা ভারতকেই দিয়ে দেয়া। ইতোমধ্যে ভারত এ এলাকাকে তাদের নিজস্ব ভূমি হিসেবেই ব্যবহার করতে শুরু করেছে। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ইতোমধ্যেই বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বসতি স্থাপনের জন্য সরকারের অনুদানও পাচ্ছে। বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ বসতি স্থাপনের ঘটনা এখন এমনই প্রকাশ্য ব্যাপার যে, সরকারের তল্পিবাহক পত্র-পত্রিকাগুলোও আর এ খবর চেপে যেতে পারছে না। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, এ সম্পর্কে সরকার এখন পর্যন্ত একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি। তবে কি ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব লুপ্ত হয়েছে? তবে কি সেখানে ভারতীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? এ সম্পর্কে সরকারের রহস্যজনক নীরবতাই প্রমাণ করে এটাই তারা চেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম তারা ভারতকে দিয়ে দিয়েছে।

অপর দিকে তেল-গ্যাস সম্পদ নিয়ে সরকার যে ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতেছে, তা থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, দেশের সমৃদ্ধির পথগুলো তারা চিরতরে বন্ধ করে দিতে চায়। সরকার বড়পুকুরিয়ার কয়লা খনি এবং মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা প্রকল্পও নানা কৌশলে বন্ধ রেখেছে। কঠিন শিলা প্রকল্প বন্ধ করে দিয়ে সরকার যমুনা

www.pathagar.com

সেতুর জন্যই ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ পাথর আমদানি করেছে। সেও ভারতকে লাভবান করার জন্যই। এমন সর্বনাশা সিদ্ধান্তের পেছনে শাসক দলের মতলব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখনও পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাসই আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। বাংলাদেশে যে গ্যাস রয়েছে তার প্রতি বর্গফুট গ্যাস ব্যবহার করা দরকার নিজস্ব প্রয়োজনে। এই গ্যাস ততটুকুই উত্তোলন করতে হবে, যতটুকু আমরা ব্যবহার করতে পারব। এর জন্য কোন তাড়াহুড়ার প্রয়োজন নেই। সে ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে তাতে গ্যাসের সংযোগ দিয়ে দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। শাসক দল সে দিকে না গিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সকল পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে, যাতে এই দেশ কখনও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে না পারে।

শাসক দল ইতোমধ্যেই দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করেছে। জাতীয় সংসদকে একদলীয় অবস্থানে নিয়ে গেছে, সুপরিকল্পিতভাবে হাজার হাজার শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে, সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়ে বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করেছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে গেছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। পুলিশ বাহিনীকে দলীয় এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। বিরোধী মতের প্রতি চরম অবজ্ঞার মাধ্যমে শাসকরা একদলীয় স্বৈরশাসন পুনঃ প্রবর্তনের অপপ্রয়াসে মরিয়া হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলকে কোন বিষয়েই কোন কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না। জনমতের প্রতি এরা থোরাই পরোয়া করছে। এই সকল আয়োজনের একটিই উদ্দেশ্য স্পট হয়ে ওঠে, তা হল দেশের ধ্বংস অনিবার্য করে তোলা। সরকার যতই বেপরোয়া হোক না কেন, যত উৎপীড়কের ভূমিকায় নামুক না কেন, দেশের মালিক চূড়ান্ত বিচারে জনগণই। জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন স্বৈরাচারী শাসক দল কোন দেশেই কখনও পার পায়নি। আওয়ামী শাসকরাও যে পার পাবে না, এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

www.pathagar.com

শান্তিবাহিনীর শর্তে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি দুর্ধর্ষ দল গত১৭ ডিসেম্বর ভোরে ভারতের মিজেরারাম সীমান্ত থেকে শান্তিবাহিনী কর্তৃক অপহৃত একজন টিএনওসহ ৮ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এনেছে। এই উদ্ধার অভিযানের সাফল্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষিপ্রতা, দক্ষতা আর সাহসিকতার আবারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সরকারি কর্মকর্তাসহ ৮ জন নিরস্ত্র বাংলাদেশীকে উদ্ধার অভিযানে সফল হওয়ায় সেনাবাহিনী সারা দেশের মানুষের প্রশংসাভাজন হয়েছে এবং পার্বত্য এলাকার বাশিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতের প্রত্যক্ষ মদদ ও ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথাকথিত 'শান্তিবাহিনী' টিএনওসহ ১০ ব্যক্তিকে গত ২৯ নভেম্বর রুমা থানার দুর্গম নৌপথ থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃত চারজন উপজাতীয়কে ছেড়ে দিয়ে থানচি থানার টিএনও আজিমউদ্দীন আহমদ চৌধুরীসহ ৬ জনকে তারা ভারতের মিজোরামের ভেতরে সীমান্তের কাছে বন্দী করে রাখে। এরও দু'মাস আগে শান্তিবাহিনী' আরও দুজন অ-উপজাতীয় বাংলাদেশীকে সেখানে নিয়ে আটক করে রেখেছিল। গৌরবদীপ্ত এবং দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত আমাদের সেনাবাহিনী এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে অপহৃতদের নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে আনে। এ থেকে আবারও প্রমাণিত হল, তথাকথিত শান্তিবাহিনীর গোপন আস্তানা ভারতের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকাতেই।

তথাকথিত শান্তিবাহিনীর পৈশাচিক বর্বরতা, নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ, খুন, গুম, অপহরণ গোটা পার্বত্য এলাকার শান্তি হরণ করে নিয়েছে। কখনও তারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষের ঘরবাড়ি, পুড়িয়ে মারছে ডজন-ডজন মানুষ, নারী-শিশু-বৃদ্ধদেরও হত্যা করছে পাইকারীভাবে। এই শান্তিবাহিনী যখন টিএনও-সহ অন্যদের অপহরণ করে নিয়ে যায়, তখনও তাদের তথাকথিত 'অস্ত্রবিরতি' চলছিল। তথাকথিত শান্তিবাহিনী এসব অস্ত্রবিরতির প্রতি বরাবরই বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে তাদের নিষ্ঠুর অপকর্ম হত্যাযজ্ঞ সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক ফ্রন্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এ ব্যাপারে কোন কথা শুনতে রাজি আছে বলে মনে হয়নি। তারা এসব অপকর্মের দায়িত্ব এড়িয়েই গেছেন সব সময়। গত ২১ ডিসেম্বরের আলোচনার পরও শান্তিবাহিনী নেতা খুন-অপহরণের দায়িত্ব অস্বীকার করেন।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল থানচি থানার নবনিযুক্ত থানা নির্বাহী অফিসার (টিএনও) আজিমউদ্দীন আহমদ চৌধুরীর অপহরণ নিয়ে। তিনি যে অপহৃত

www.pathagar.com

হয়েছেন, তাকে যে শান্তিবাহিনী অপহরণ করেছে, তাকে উদ্ধারের জন্য যে সরকার সচেষ্ট—এরকম কোন কথাই সরকারের তরফ থেকে বলা হল না। সরকারের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার অপহরণ নিয়ে সরকারের এই নীরবতায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হল গোটা দেশের মানুষের মধ্যে। নিশ্চুপ রইল কল্পনা চাকমার তথাকথিত অপহরণ ঘটনায় রাজপথ গরম করা বিভিন্ন নেতৃবৃন্দও। এমনকি তাদের উদ্ধারের পরও সরকার থাকল চুপ করে। যেন এ ব্যাপারে সরকার কোন পক্ষ নয়, তাদের কোন দায়িত্ব নেই। গত ২১ ডিসেম্বর সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তিবাহিনীর রাজনৈতিক ফ্রন্ট জন সংহতি কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়। সে বৈঠকে সমিতি শান্তিবাহিনীর পাঁচ দফা দাবি পেশ করে এবং ৩১ মার্চ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতির প্রতিশ্রুতি দেয়, যে প্রতিশ্রুতি এর আগেও শান্তিবাহিনী কখনও পালন করেনি।

কিন্তু কী আছে শান্তিবাহিনীর এই পাঁচ দফা দাবিতে সে বিষয়টি পুনরুল্লিখিত হয়নি। তথাকথিত শান্তিবাহিনীর পাঁচ দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। তা প্রকৃতপক্ষে ৪৬ দফা দাবিনামা। শান্তিবাহিনী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যা চায় তা হল, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র এলাকা ঘোষণা করতে হবে এবং বাঙালিদের সেখানে পারমিট বা পাশপোর্ট নিয়ে ঢুকতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী সকল বাঙালিকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে আনতে হবে। এসব দাবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাই তাদের আসল দাবি। জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আওয়ামী এমপি আবদুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন কমিটির সঙ্গে গত ২১ ডিসেম্বর আলোচনা শেষে শান্তিবাহিনী নেতা জে বি লারমা বলেছেন, নতুন সরকারের উদ্যোগে কিছু নতুন ব্যাপার আছে এবং আমরা নতুন অনুভূতি পাচ্ছি।

কিন্তু গত ২১ ডিসেম্বর দৈনিক নিউ নেশান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। নিউ নেশান পত্রিকার শীর্ষ সংবাদে বলা হয়েছে শান্তিবাহিনীর দাবির মুখে টিএনওসহ অপহৃত আট ব্যক্তিকে উদ্ধারে সফল অভিযানের পর সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে ৮টি সেনাক্যাম্প ও ৫টি আউটপোস্ট বন্ধ করে দিয়েছে। এই ব্যবস্থা না কি বৈঠকের পর ১০ দিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কাজটি সরকার করেছে ১৭ ডিসেম্বরের পর আর কাকতালীয়ভাবে হলেও সত্য, ১৭ ডিসেম্বর সেনাবাহিনী মরণপণ সাফল্য দুর্ধর্ষ অভিযানের মাধ্যমে টিএনওসহ ৮ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আনে।

শান্তিবাহিনীর সঙ্গে আলোচনার শর্ত হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হলে কোন দিন যে শান্তিবাহিনী ওই এলাকায় গণহত্যা অভিযান পরিচালনা করবে না—তার নিশ্চয়তা কোথায়?

www.pathagar.com

সরকার হটিয়ে হলেও রাখতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আওয়ামী লীগকে যারা বসিয়েছে, তাদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেই বিদেশী প্রভুদের নীল নকশা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকার দেশের কল-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, সীমান্ত খুলে দিয়ে দেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করেছে। বিদেশে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক, চামড়া, মাছের বাজার ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। আর সেই প্রভুদের নীল নকশা অনুযায়ীই সরকার বাংলাদেশকে টুকরো করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্যত ভারতের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে।

আওয়ামী লীগ ঘোষণা করেছে, এ মাসের ১৬ তারিখেই তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে নৃশংস শান্তিবাহিনীর সঙ্গে তথাকথিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করবেই। সরকার সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সঙ্কটের শুরু

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সঙ্কট আছে। সে সঙ্কট তৈরি করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাংলাদেশের উপজাতীয় নাগরিকদের বাঙালি বানানোর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার শুরু। শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রদ করে তাদের বলেছিলেন, তোরা বাঙালি হয়ে যা।

এতে উপজাতীয় নাগরিকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। আর সে সুযোগ লুফে নিয়েছিল ভারত। শেখ মুজিবের এই ঘোষণার পর ভারত চাকমা নাগরিকদের মধ্যে নানা ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে এবং মদত ও প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে নাশকতামূলক কাজ করাতে শুরু করে। সেও শেখ মুজিবুর রহমানের স্বৈরশাসনকালেই। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানও ভারতীয় নেতাদের এই আচরণের কোনরূপ প্রতিবাদ করার সাহস করেননি।

ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামকে তাদের নিয়ন্ত্রণে চায়। শেখ মুজিবুর রহমান সে কথা জানতেন না বা বুঝতেন না—এমন কথা বলা খুবই কঠিন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, শেখ মুজিব ভারতের এই আকাঙ্ক্ষা ও চক্রান্তের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তবে কি ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য সব কিছু জেনেও তখন শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন? তিনিও কি চেয়েছিলেন এ সময় বাংলাদেশকে টুকরো করে ভারত পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের খবরদারি প্রতিষ্ঠা করুন।

শেখ মুজিবের স্বপ্ন কী ছিল?

শেখ মুজিবুর রহমানের মেয়ে শেখ হাসিনা অবিরাম বলে যাচ্ছেন যে, তিনি 'তার আব্বার স্বপ্ন বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। তা থেকেও প্রমাণিত হয়, শেখ মুজিবও

www.pathagar.com

ভারতের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের হাতে তুলে দিতে। তিনি তার সেই আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তার মেয়ে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ক্ষমতায় এসে শেখ মুজিবের সেই কাজ সম্পন্ন করছেন। এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমান যেমন এদেশের জনগণকে পরোয়া করেন নি, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের কথা দেশবাসীকে জানান নি, তার যোগ্য উত্তরসূরী শেখ হাসিনাও ব্যাপারটি জনগণের সম্পূর্ণ অগোচরে রেখেছেন। যেন বাংলাদেশ কারও তালুক। সেখান থেকে যখন যতটুকু খুশী যাকে-তাকে দিয়ে দেবেন, তাতে কারও কিছু বলার নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছেন, কিন্তু বাদ সাধছে বিরোধী দল। তিনি বিরোধী দলের এই বাদ সাধার কারণও আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, বিরোধী দল শান্তি চায় না।

কার সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তি

প্রথম কথা শেখ হাসিনা সরকারের তথাকথিত এই 'শান্তিচুক্তি' কার সঙ্গে স্বাক্ষর করেছেন? পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত তথাকথিত শান্তিচুক্তি তিনি স্বাক্ষর করছেন একটি লুটেরা, ঘাতক, গণহত্যাকারী বাহিনীর সঙ্গে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে হাজার হাজার নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। যারা শত শত বাংলাদেশী নাগরিককে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের হত্যা করেছে, সেই ঘাতক বাহিনীর সঙ্গে 'শান্তিচুক্তি' করতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই বাহিনীর নেতা ভারতে থাকেন। ভারতীয় পাসপোর্টে বিদেশ ভ্রমণ করছেন, তিনি ভারত থেকে সীমান্ত পথে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার তাকে হেলিকপ্টারে করে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে জামাই আদরে রেখে আলাপ-আলোচনা করছেন। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে, ভারতীয় পাসপোর্টধারী সন্তু লারমার সঙ্গে সরকারের এই দহরম মহরমের কারণ কী?

অন্য এলাকায় একই দাবি উঠলে কি হবে?

তাছাড়া দেশের একদল নাগরিকের সঙ্গে সরকার চুক্তি করতে যাচ্ছে কিসের ভিত্তিতে? আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের একদল চাকমা নাগরিক সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংবিধান বিরোধী চুক্তিতে সরকারকে বাধ্য করতে পারলে দেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে এবং দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা নাগরিকরা খুন-গুমের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস পাচ্ছে। আগামীকাল যদি সিলেটবাসীরা অনুরূপ দাবি তোলে তবে তাদের ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে?

আমাদের মন্তব্য হল, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তি নিশ্চিত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে। তারা সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। চুক্তি যদি করতে হয়, তা হলে সে চুক্তি করা দরকার ভারতের সঙ্গে। কারণ ভারতই তথাকথিত শান্তিবাহিনীকে মদত-অস্ত্র-প্রশিক্ষণ এবং আশ্রয় দিয়ে এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং জিইয়ে রেখেছে।

www.pathagar.com

শান্তিবাহিনী কি বিলিজারেন্ট সরকার

সরকার যে প্রক্রিয়ায় শান্তিবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে, তাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সরকার শান্তিবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যা দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিরোধী ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী কোন কোন সংবাদপত্র গণহত্যাকারী শান্তিবাহিনীর নেতা সন্তু লারমাকে প্যালেস্টাইনী নেতা ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্যালেস্টাইনের মর্যাদা দিচ্ছেন এবং সন্তু লারমাকে সেই প্যালেস্টাইনের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তবে বিলিজারেন্ট সরকার হিসেবে প্যালেস্টাইনী নেতা ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইনী নেতা হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বহু আগে। সরকার কি তবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্যালেস্টাইনের মর্যাদা দিচ্ছেন? অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে সরকার নিজেই বিলিজারেন্ট সরকারের প্রধান হিসেবে জাতিসংঘে সন্তু লারমার আসন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। কারণ ভারত তাই চায়।

সে দিক থেকে আমাদের বক্তব্য হল, সরকার তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের ইচ্ছায় যে চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছে তা স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বিরোধী এবং সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। যে কোন মূল্যে দেশের সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী সরকারের এই ষড়যন্ত্র রুখতে হবে।

দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় চক্রান্তকারীদের প্রতিহত করতে হবে

বিষয়টি যে বাংলাদেশের অখণ্ডতা বিরোধী ষড়যন্ত্র তা এখন দিবালোকের মত সত্য হয়ে উঠেছে। কারণ তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সরকারের আলাপ-আলোচনা ও চুক্তির খসড়া করা হচ্ছে সম্পূর্ণ গোপনে, দফায় দফায় শান্তিবাহিনীর নেতাদের সঙ্গে কি আলোচনা হচ্ছে, তার বিন্দু বিসর্গও জনসাধারণকে জানতে দেয়া হচ্ছে না। যে বিষয়ের সঙ্গে দেশের অখণ্ডতার প্রশ্ন জড়িত, যা দেশের এক-তৃতীয়াংশ ভূমিকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, সেরকম এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এত ঢাক ঢাক গুড়গুড় করা হচ্ছে কেন? কেন এই বিষয়টি জাতীয় সংসদেও আলোচনা করা হচ্ছে না?

পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার এই চুক্তি সম্পাদনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনানিবাসে সেনাবাহিনীকে রাখলে, সকল আউট পোস্ট থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বাঙালিদের উৎখাত করবে শান্তিবাহিনী। তাদের ন্যূনতম নিরাপত্তা থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন চলে যাবে শান্তিবাহিনীর হাতে। ফলে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে যাবে সম্পূর্ণরূপে শান্তিবাহিনীর তথা ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম। যে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ছেড়ে দিতে চাইবে ভারতীয় ক্রিড়নক শান্তিবাহিনীর হাতে সে সরকার ভারত প্রেমিক হতে পারে, দেশপ্রেমিক হতে পারে না। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক হতে পারে না। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা সরকারের বিনিময়ে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষ অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বাধীনতা যখনই বিপন্ন হয়েছে, তখনই একাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে এদেশের মানুষ। ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলেছে। তার প্রমাণ ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক সিপাহী-জনতার বিপ্লব। আওয়ামী লীগ সরকার আজ দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাবিরোধী যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, ইনশাআল্লাহ, এদেশের মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে সে ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে। আর চক্রান্তকারীরা নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক মিথ্যাচারিতার নিকৃষ্ট নমুনা

হাসিনা-এরশাদ-রব কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য আবদুস সামাদ আজাদ, তোফায়েল আহমদ, লে. জে. (অব.) নূরউদ্দীন খান, আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ নাসিমরা জাতীয় সংসদে, সংসদের বাইরে, জনসভায় এমনকি বিদেশে এবং ভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে অবিরাম এবং বেপরোয়াভাবে অসত্য বক্তব্য দিয়েই যাচ্ছেন। তথ্য প্রমাণ দিয়ে কোন অসত্য খণ্ডন করা হলে, দু'একদিন চুপ থেকে আবার একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। ফলে প্রতিবাদকারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। একই মিথ্যা বক্তব্যের কতবার প্রতিবাদ করা যায়।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হল, একটি মিথ্যাকে হাজার বার বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করে সত্যে পরিণত করা। সাধারণত ফ্যাসিস্ট চরিত্রের সরকারই এ ধরনের শঠতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। আর মিথ্যাকে বারবার প্রচার করে তাকে সত্যে পরিণত করার কৌশলও এসেছে পৃথিবীর প্রথম ফ্যাসিস্ট সরকার হিটলারের কাছ থেকে। হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবল্‌স এই তত্ত্বের উদ্‌গাতা। তিনিই বলেছিলেন, একটি মিথ্যা শতবার বললে তা সত্যে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারও একই মিথ্যা কথা শতকণ্ঠে শতবার বলে ফ্যাসিবাদী কায়দায় তাকে সত্যে পরিণত করার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে।

হাসিনা-এরশাদ-রবের আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জাসদের কোয়ালিশন সরকারের মিত্র হু. মু. এরশাদও কোন কোন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একই মিথ্যাচারে শরিক হচ্ছেন। সরকারে শরিক হলে মিথ্যাচারে শরিক হতে বাধা নেই। তবে হু. মু এরশাদের মিথ্যাচারিতা, ভণ্ডামি, ব্যাভিচারিতা সর্বজনবিদিত। তিনি কী বললেন না বললেন তাতে খুব বেশি কিছু যায়-আসে না। সাধারণ মানুষ তাকে চেনে। হু. মু এরশাদও তার নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনকালে এরকম বহু মিথ্যাচারিতা ও ভণ্ডামি করেছিলেন। সেসব মিথ্যার কোনটাই জনগণের কাছে অজানা থাকেনি। কিন্তু বন্ধু বলে কথা। হু. মু. এরশাদ এবার তার কোয়ালিশন পার্টনারকে খুশি করতে মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছেন। যেমন বিএনপি শাসনকালে কোন উন্নয়নই হয়নি, সার নিয়ে বিএনপি সরকারের আমলে ১৭ জন কৃষক নিহত হয়েছিল, রাশেদ খান মেনন তার কাছ থেকে মাসে ৫০ হাজার করে টাকা নিতেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা মানি, সকল মিথ্যা মিথ্যা নয়। সকল মানুষের সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকবে, তথ্য প্রমাণাদি থাকবে, এমনও ভাবা যায় না। ফলে, না জেনে, তথ্য প্রমাণ

www.pathagar.com

ছাড়া অনুমানের ভিত্তিতে কেউ এমন কথা বলতে পারেন, যা সত্য নয়। পরবর্তীতে কেউ সঠিক তথ্যটি প্রকাশ করলে নিজের ভুল স্বীকার করে নিলেই অনেক সময় ল্যাঠা চুকে যায়। এ নিয়ে আর বাদ-বিসম্বাদের কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে সত্য প্রকাশ করে দিলেও যদি বিনা প্রমাণে কেউ অসত্যটাই অবিরাম বলতে থাকে, তবে তার মতলব নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বোঝা যায়, অবিরাম মিথ্যা বলে মিথ্যাকে সত্য বানানোর নিকৃষ্ট কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে জাতীয় সংসদে এবং জাতীয় সংসদের বাইরে বারবার বলেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নাকি ১৯৯৩ সালে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনাকালে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দাবি করার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। বিএনপির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বারবার প্রতিবাদ জানানো হয়। পরে গত মাসে বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় তথ্য প্রমাণসহ এক নিবন্ধ লিখে দেখান যে, ঢাকা-দিল্লি যুক্ত ইশতেহারে পানি বণ্টন নিয়ে সুস্পষ্ট সমঝোতার কথা বলা আছে। তবে হ্যাঁ, ভারত কথা রাখেনি। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন—এমন বাজে কথা একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখে কি শোভা পায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওই ঘটনার পরও প্রধানমন্ত্রী পুনরায় একই কথা উচ্চারণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীরা বলেই চলেছেন যে, বিএনপি সরকার নাকি অর্থনীতি ধ্বংস করে রেখে গেছে। এরকম একটি ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে কিনা সে কথা আলাদা। আর যদি এর কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তা হলে সে ক্ষতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আওয়ামী লীগ ও তার দীর্ঘকালের মিত্র এরশাদকেই। বিএনপি শাসনকালের শেষ দিকে দু'বছর জ্বালাও-পোড়াও, গাড়ি ভাঙচুর, হরতাল, ধর্মঘট-অবরোধ করে অর্থনীতিকে পিছনে টেনে ধরেছিল আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিএনপি শাসনকালে মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছিল ১৭০ মার্কিন ডলার থেকে ২৪৩ মার্কিন ডলারে। আওয়ামী লীগের আপনজন এরশাদের নয় বছরের স্বৈরশাসনকালে মানুষের মাথা পিছু আয় শেষ পর্যন্তও ছিল ১৭০ ডলার। তা ছাড়া এরশাদ পতনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। বিএনপি শাসনকালে এত গোলযোগের পরও সে রিজার্ভ ছিল ৩০৯ কোটি মার্কিন ডলার। আওয়ামী লীগ সরকার গত ৯ মাসে ওই রিজার্ভ ভেঙে খাচ্ছে, একটি নতুন ডলারও তাতে যুক্ত করতে পারেনি। তা হলে কেন প্রধানমন্ত্রী নিজে এখনও সেই ভাঙা ঢাক পিটিয়ে যাচ্ছেন?

একইভাবে বিএনপি সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে নাকি ধ্বংস ডেকে এনেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারই হিসাব দিয়েছে ১৯৯০ সালে দেশে যেখানে সাক্ষরের হার ছিল প্রায় ২৭ শতাংশ; বিএনপি শাসনকালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ শতাংশে। এর নাম কি শিক্ষাখাত ধ্বংস নাকি শিক্ষাখাতে বৈপ্লবিক অগ্রগতি।

এমনি আরও উদাহরণ দেওয়া যায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই। বিস্তারিত আলোচনায় বোধকরি প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিথ্যাচার চলছে টেলিফোন নিয়ে, মিথ্যাচার চলছে গঙ্গার পানি নিয়ে, মিথ্যাচার চলছে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে,

www.pathagar.com

মিথ্যাচার চলছে ইতিহাস নিয়ে। যেন মানুষের কিছুই মনে থাকে না। যেন বাংলাদেশের সকল মানুষ মানসিক প্রতিবন্ধী।

বিদেশ সফর নিয়েও এমন কাণ্ড আছে। ফটো সেশনকে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা, তিনজন নেতার ডাকে দুই জন রাষ্ট্র/সরকার প্রধানের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ঋণ সম্মেলনকে 'বিরাট সাফল্য' বলে প্রচার করা—এসব তো আছে।

কিন্তু সম্প্রতি এই অসত্য বক্তব্য দানের ধারায় সকলকে টেক্কা দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ। গত ১৩ মার্চ দিল্লি থেকে ফিরে জনাব আজাদ সাংবাদিকদের বলেন যে, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ব্যাপারে পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সঙ্গে কথা হয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিমত নেই, তা তিনি আমাকে পরিষ্কার করে জানিয়েছেন।' সামাদ আজাদ সাহেবের এই বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে সার্কভুক্ত দেশ পাকিস্তান উপ-আঞ্চলিক জোটের পক্ষে।

কিন্তু পরের দিন ঢাকাস্থ পাকিস্তান হাই কমিশন সুস্পষ্টভাবে জানায় যে, 'সার্কের অধীনে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে ইসলামাবাদের আপত্তি রয়েছে।' অর্থাৎ যে অসত্য বক্তব্য ইতিমধ্যে শুধু দেশীয় ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সামাদ আজাদ সাহেব তাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিলেন। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন, দেশের সকল মানুষকে অবিরাম অসত্য বক্তব্য দিয়ে যেমন বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন, তেমনই বোকা বানাবেন বিদেশী কোন রাষ্ট্রকেও। কিন্তু তার বক্তব্য পাকিস্তানের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এমন অসত্যাচার আর কত দিন?

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কি আমাদের নয়? শাহজাহান জানতে চাইলেন

জানুয়ারি ১৭। শনিবার। রাতে ঘন কুয়াশায় চট্টগ্রাম নগরীর সোডিয়াম বাতিগুলো ম্লান আলো দিচ্ছিল। সকালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে চট্টগ্রাম থেকে বান্দরবান রওয়ানা হতে সকাল ৯টার ওপর বেজে গেল। চট্টগ্রাম থেকে বান্দরবান শহর মোটামুটি আড়াই ঘণ্টার পথ। ঘণ্টা দেড়েক চলার পর দূরে পাহাড়ের রেখা চোখে পড়ল। পাহাড়ের ওপরে থমথমে কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। ওই পাহাড় ডিঙিয়ে এক উপত্যাকায় নয়নাভিরাম ছোট্ট শহর বান্দরবান। মাইক্রোবাস ছুটছিল মোটামুটি ৭০ কিলোমিটার বেগে।

দৃশ্যপটে বান্দরবানের পাহাড় ভেসে আসতেই যাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের স্তব্ধতা নেমে এল। কথা হচ্ছিল পার্বত্য চুক্তির নানা প্রসঙ্গে। এর সংবিধান বিরোধী ধারা, এর মৌলিক অধিকার বিরোধী ধারা, এর মানবতাবিরোধী ধারা নিয়ে। আমরা নিজেরাই তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছিলাম। তখনই দিগন্তে পার্বত্য রেখা। সবাই চুপ করে গেলাম একসঙ্গে।

আওয়ামী লীগের শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসীন হবার পর পার্বত্য এলাকার সন্ত্রাসী ও গণহত্যাকারী শান্তিবাহিনীর সঙ্গে ২ ডিসেম্বর '৯৭ কালো চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তিতে সরকারের পক্ষে ছিলেন সংসদে চীফ হুইপ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, আর সন্ত্রাসীদের পক্ষে ছিলেন গোপন ঘাতক বাহিনীর নেতা সন্তু লারমা। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনে বিষাদের যে ছায়া নেমে এসেছিল, সে ছায়া গ্রাস করেছে পার্বত্য অঞ্চলের গিরিশৃঙ্গগুলোকে। যেন প্রিয়তম সন্তান থেকে বিচ্যুত হয়ে আছেন কোনো বিষন্ন মা। এই বিচ্ছেদ প্রয়াসে মায়ের হৃদয় যেমন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়, তেমনি ভারাক্রান্ত হয় সন্তানের হৃদয়ও। তার ওপর যদি বলপ্রয়োগ করে, উভয়ের অমতে ঘটানো হয় এই বিচ্ছেদ, সে বেদনার সীমা পরিসীমা থাকে না। তখন বিষণ্নতা শুধু বিষণ্নতাই থাকে না, তা বিদ্রোহে রূপ নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন বিষণ্নতায় ভারী, বিদ্রোহের অপেক্ষায়।

বেশ কিছু দূর পাহাড়ী পথ পেরিয়ে এলাম। উঁচু উঁচু পাহাড়ে টিলায় সবুজ ঘাস মরে ম্লান। কোথায়ও বুনো মুলি বাঁশের ঝাড়। কোথায়ও কোথায়ও হয়ত এমনিই ফলে আছে বুনো কলা। ঝুলে আছে কলার কাঁদি। আর সব বিরান। পাহাড়ের টিলায় কিংবা গিরিখাদে পাহাড়ী বা বাঙালিদের বসবাস।

আমাদের মাইক্রোবাস দুটি গিয়ে থামল সোয়ালাখ এলাকায়। সেখানে একটি সিনেমা হল নির্মাণের কাজ চলছে। কাজ করছেন কয়েকজন বাঙালি শ্রমিক।

www.pathagar.com

সড়কের পাশে একটি বাঙালি পরিবার। জীর্ণশীর্ণ ঘরবাড়ি। দু'তিনটি অল্প বয়সী শিশু। এই শীতেও জীর্ণ পোশাক। পায়ে জুতা নেই। স্বাস্থ্যহীন মায়ের বিষণ্ন মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢাকা। পরনে অতি সস্তার শাড়ী। ছোট বাড়ির উঠানে কয়েকটি কলা ও কাঁঠাল গাছ। হাউলি বেড়ার ফাঁক দিয়ে বধূ উঁকি দিলেন আগত লোকদের দিকে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে জাসাস সভাপতি রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রায় ২০ জনের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল পার্বত্য অঞ্চলে জনসংযোগ সফরে গিয়েছিলাম। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন জাসাস সাধারণ সম্পাদক অভিনেতা ওয়াসিমুল বারী রাজীব, সহ-সভাপতি খুরশীদ উজজামান উৎপল ও বাবুল আহমেদ। এই দলে আরও ছিলেন এমএ খালেক, মোঃ লিয়াকত আলী, অধ্যাপক শেখ মোঃ মহিউদ্দীন, এডভোকেট মাহফুজুর রহমান, মামুনুল ইসলাম হুমায়ূন, দিলশাদ আলম, জাহাঙ্গীর আলম রিপন, খালেদ হায়দার মুন্না, সাজ্জাদ আহমেদ, মনজুর কাদের, শাফি প্রমুখ।

সোয়ালাখে নামলাম আমরা সবাই। সেখানকার কালো চুক্তি বিরোধী নেতারা আমাদের স্বাগত জানালেন। বললেন, প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান গেছেন বান্দরবান। তাকে বলে দেয়া হয়েছে, তিনি যেন দুপুর ঠিক ১২টায় সোয়ালাভ এলাকা পার হয়ে চলে যান।

তখনও দুপুর১২টা বাজেনি। আমরা দাঁড়ালাম। যে নির্মাণ শ্রমিকরা কাজ করছিলেন, তাদের একজনের নাম শাহজাহান। বয়স ২২। জন্ম থেকেই বান্দরবানে আছেন। বললেন, এখন আর পাহাড়ীদের কাজ করা যায় না। কাজ করলে টাকা তো দিতেই চায় না, বরং উল্টো গালিগালাজ করে। সে জন্যই তিনি বান্দরবান শহর থেকে এত দূরে এসে কাজ করছেন। একই রকম কথা বললেন অন্য শ্রমিকরাও। বললাম চলে যাবেন এখান থেকে। জবাবে সবাই সমস্বরে বললেন, কেন যাব, কোথায় যাব? বাংলাদেশ কি আমাদের নয়?

www.pathagar.com

'মেঘলা' হ্রদ যেন পার্বত্যাঞ্চলের লাখো মানুষের অশ্রুর সঞ্চয়

বাংলাদেশ কি আমাদের নয়? সোয়ালাখে এই প্রশ্ন করে শাহজাহান আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তাকে ঠিক কী জবাব দেয়া দরকার বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে উদ্বাস্তু করে বিতাড়নের যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, তারপর তাকে কোন মুখে বলি বাংলাদেশ আপনারও দেশ। বাংলাদেশের সংবিধান আপনাকে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার যে কোন স্থানে বসতি স্থাপনের অধিকার দিয়েছে। এখানে থাকতে চাইলে আপনি পারেন, কেউ বাধা দিতে পারবে না।

একদল ডাকাতের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার তথাকথিত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বাংলাদেশী মানুষদের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসের অধিকার, চাকরির অধিকার, বসতি স্থাপনের অধিকার, ভোট দেয়ার অধিকার, ভোটে দাঁড়াবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। কার্যত পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ১০ লাখ বাসিন্দার মধ্যে চাকমা ছাড়া অন্য ৮ লাখ বাঙালি ও উপজাতীয়কে চাকমাদের কৃপার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। চুক্তির বলে ৩০ হাজার বাঙালি ও উপজাতীয় নাগরিক হত্যাকারী শান্তিবাহিনী এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে পুলিশ বাহিনীতে পরিণত হচ্ছে। এরপরও কি বাঙালিরা সেখানে থাকতে পারবে?

জাসাস সাধারণ সম্পাদক চলচ্চিত্রের অতুলনীয় অভিনেতা ওয়াসিমুল বারী রাজীবকে স্বচক্ষে দেখার জন্য ততক্ষণে কয়েক শ' বাঙালি ও উপজাতীয় নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সমবেত হয়েছেন। সবাই রাজীবের কাছাকাছি এসে করমর্দন করতে চান, একটু কথা বলতে চান, দু'একটা কথা শুনতে চায়। রাজীব কথা বলছিলেন তাদের সঙ্গে। সমবেত জনতার কাছে তার বান্দরবান আসার কথা ব্যাখ্যা করছিলেন। বলছিলেন, আপনারা একা নন, বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষ আছে আপনাদের পাশে। প্রয়োজনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে লাখ লাখ মানুষ আমরা লং মার্চ করে আসব পার্বত্য চট্টগ্রামে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করা হবে দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি।

তখন দুপুর ঠিক বারোটা। প্রতিমন্ত্রী সামনে পেছনে পুলিশের পাহারা নিয়ে পার হয়ে গেলেন সোয়ালাখ এলাকা। বান্দরবানের নেতাদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। একজন বললেন, মন্ত্রী কথা রেখে ভাল করেছেন। তা না হলে বান্দরবান শহরে পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত। এই পথ দিয়ে বান্দরবান যাওয়ার সময়ই মন্ত্রীর বহরকে বলে দেয়া হয়েছিল দুপুর ১২টার মধ্যে না ফিরলে বান্দরবানে উদ্ভূত

www.pathagar.com

পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব বিরোধী দল গ্রহণ করবে না। প্রতিমন্ত্রী সে ঝুঁকি নেননি।

গাড়ি ছুটে চলেছে পাহাড়ী পথ ধরে। আঁকাবাঁকা পথ, কোথায়ও সোজা ওপরে উঠে গেছে আবার তেমনি নেমে গেছে খাড়াখাড়ি। তার মধ্যে বাস ভর্তি করে আসছে যাচ্ছে মানুষ। পাশাপাশি সামনে বাঙালি-উপজাতীয়। কেউ কেউ আলাপে মশগুল। কারও দৃষ্টি বাইরের দিকে।

বাইরের দৃশ্যপট প্রায় একই। কিন্তু চোখ ফেরে না। কোথায়ও কোথায়ও রাস্তা করার সুবিধার্থে খাড়া পাহাড় কাটা হয়েছে। মাটি লাল। সে মাটি আটকানোর জন্য পথের পাশে ছোট দেয়াল। পাহাড়ের ঢালে কোথায়ও কোথায়ও সরকারের উদ্যোগে শাল-সেগুনের গাছ। ছোট গাছে বড় বড় ভারী লাল পাতা দুলছে, যেন নাদুশ-নুদুশ শিশু দোল খাচ্ছে মায়ের হাতে।

গাড়ি এসে থামল মেঘলা টুরিস্ট স্পটে। এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। পাহাড়ের টিলায় টিলায় সূর্যকিরণের প্রতিফলন। সুউচ্চ পাহাড় আর গভীর গিরিখাদগুলো এখান থেকে দেখা যায়। মেঘলা স্পটের অনেক নিচে একটি প্রাকৃতিক হ্রদ। ছোট কিন্তু গভীর। বাংলাদেশের পাহাড় চুইয়ে চুইয়ে আবদ্ধ গিরিখাদে জমেছে স্বচ্ছ পানি। যেন লাখো মানুষের বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণার সঞ্চয়।

পানির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বান্দরবানের মানুষের হৃদয় নিংড়ানো অশ্রুর ভেতরে দেখলাম নিজের মুখচ্ছবি। এই গিরিশৃঙ্গ, গিরিখাদ, হ্রদের এই শান্ত পানি, নয়ন কাড়া নৈসর্গিক শোভা সব কিছু দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিয়ে নির্বিকার ক্রিকেট খেলা দেখছেন শেখ হাসিনা। বুকের ভেতরের গাঢ় বেদনা উথলে উঠল। সবার অজান্তেই হ্রদের পানিতে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা চোখের পানি। সামান্য ঢেউয়েই খান খান হয়ে গেল আমার মুখচ্ছবি। মেঘলার পানিতে মুখ ধুয়ে স্থির হলাম।

সেখান থেকে উঠলাম সবাই। কেউ কেউ ছবি তুললেন। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, স্বদেশের এই স্মৃতি, তার ধূলি-পাথর-পানিতে মাখামাখির জন্য সন্তানের কতই না ব্যাকুলতা। মাতৃভূমির এই পুণ্য জমিন কেড়ে নিয়ে যাবে দুর্বৃত্ত? তাও কি হয়।

আমরা সবাই গিয়ে উঠলাম গাড়িতে। সবাই চুপচাপ। গাড়ির স্টিয়ারিং তখন ধরলেন রাজীব। কিছুদূর গিয়ে বললেন, শুটিং-এর সময় এখানে কতদিন চেজিং ড্রাইভ করেছি। কেন এমন স্বগতোক্তি করলেন রাজীব। আমরা প্রশ্ন করিনি। তিনিও আর কিছু বললেন না। গাড়ি থামল বান্দরবান প্রেসক্লাব এলাকায়।

তখন দুপুর প্রায় দুইটা। শহরে মাইকিং চলছে আমাদের জনসভার। নেমেই বেরিয়ে পড়লাম। সারা শহরের প্রতিটি ভবনে উড়ছে কালো পতাকা।

www.pathagar.com

প্রতিবাদের ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল : চুক্তি মানি না

১৭ জানুয়ারি বান্দরবানে ঢাকার মত শীত ছিল না। সেখানে গরম। চারদিকে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহর। যেন সাজানো বাগান। শহরের মাঝ দিয়ে চলে গেছে শঙ্খ নদী। শঙ্খ কখনও শুকায় না। শীতে এর প্রবাহ কমলেও পাহাড় থেকে কেটে আনা দীর্ঘ বাঁশের ভেলা চলতে থাকে। অবিরাম চলে শাম্পান। শাম্পানে বোঝাই করে কৃষিপণ্য নিয়ে আসে দূর গ্রামে বসবাসকারী বাঙালি পাহাড়িরা। কখনও কখনও একই শাম্পানে, কখনও বা আলাদা আলাদাভাবে। শঙ্খ নদীর ওপর শক্ত সেতু। সে সেতু যেন বাঙালি-পাহাড়ির মধ্যে সেতুবন্ধন। বর্মা থেকে উৎপন্ন শঙ্খ নদী বর্ষায় ভরে যায় কানায় কানায়। তখন শঙ্খ হয় উদ্ভিন্ন যৌবনা, চঞ্চলা হরিণীর মত ছোটে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

শঙ্খ নদীতে সেদিনও ভাসছিল মূলী বাঁশের শ' শ' ভেলা। শাম্পান এসে ভিড়ছিল শহরের কিনারে। গভীর শঙ্খের পানি এখন অনেক নিচে। তবু স্রোতস্বিনী।

সেতুর ওপারেই দেখা হল মারমা যুবক চায়িং শিং-এর সঙ্গে। সে স্থানীয় সরকারী হাই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে। বাবা পরিষদে চাকরি করেন। সে উপলক্ষ্যে তারা বান্দরবান থাকে। মা করে ঘরের কাজ। ছোট ভাইও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তাদের পড়াশোনা ফ্রি। গ্রাম কক্সবাজারের কাছে। বান্দরবান থেকে যেতে সারাদিন লাগে। তার গ্রামের এলাকায়ও বাঙালিদের বসতি আছে। আঠারো বছরের এই তরুণ নিজ এলাকায় বাঙালি-পাহাড়ি বিবাদ দেখেনি। চায়িং শিং বলল, চুক্তি করার ফলে এখন কোথায় যেন দূরত্ব বাড়ছে বাঙালি-পাহাড়িদের মধ্যে। শান্তিতেই তো ছিলাম। চুক্তি না করলেই ভাল হত।

বান্দরবানে ঢোকার মুখে তনচইঙ্গা উপজাতীয় ছাত্রদের হোস্টেল যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি আছে জামে মসজিদ। বিবাদ হয়নি কোনোদিন। এ ছাড়াও বান্দরবানে আছে বম, চাকমা, খোয়াম, মুরং, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি উপজাতীয় নাগরিক। মিলে মিশে আছেন দু'শ' আড়াই শ' বছর ধরে। বিশ্বাস আর আস্থা নিয়ে, পরস্পরের সুখে-দুঃখে একাকার হয়ে।

কথা হল মোহাম্মদ আবু সিদ্দিকের সঙ্গে। ফলের ব্যবসা করেন বান্দরবানে প্রায় ২০ বছর ধরে। তার বাবা চিটাগাং থেকে বান্দরবানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। জমিজমা যা আছে বাবার নামে। বড় ভাইও ব্যবসা করেন। তার সামান্য জমি আছে। আবু সিদ্দিকের ব্যবসা আছে জমি নেই। বাবার

www.pathagar.com

জমির অংশ ভবিষ্যতে পাবার আশায় জমি করেননি তিনি, বাড়িয়েছেন ব্যবসা। এখন কি করবেন আবু সিদ্দিক? শেখ হাসিনা যে চুক্তি সম্পাদন করেছেন তাতে আবু সিদ্দিককে পাড়ি দিতে হবে পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে ভিন্ন কোথায়ও। কোথায় যাবেন বান্দরবানে জন্মগ্রহণকারী প্রায় ৩৫ বছরের যুবক আবু সিদ্দিক? বান্দরবান তাকে ছাড়তে হবে—একথা ভাবতেও পারেন না তিনি। বললেন, অত সহজ নাকি? শেখ হাসিনা বলল আর চলে গেলাম। আমি বান্দরবানের ছেলে। শেখ হাসিনা কে?

আবু সিদ্দিকের বড় ভাই বিয়ে করেছেন মারমা এক নারীকে। সেও প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। তাদের ঘরে দু'সন্তান। সন্তান দুটোর নাক চ্যাপ্টা, মায়ের মত। মারমা শ্বশুর বাড়িতে যাতায়াত আছে তার ভাইয়ের, সিদ্দিকেরও। কোনোদিন তো কোনো সমস্যা হয়নি। শুধু সিদ্দিকের বড় ভাই নয়, বান্দরবানের সমাজে এ রকম বিয়ের ঘটনা বিরল নয়। তা নিয়ে সামাজিক সঙ্কট হয়নি। তাদের কথা ফেরদৌসী যদি বিয়ে করতে পারে হিন্দু রামেন্দু মজুমদারকে, পিযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বিয়ে করতে পারে মুসলমান মেয়েকে এবং তাতে যদি কোনো সামাজিক সঙ্কট না হয়, তা হলে বান্দরবানে এ রকম বিয়েতে সমস্যা কেন হবে।

শহরের উপকণ্ঠে মধ্যপাড়া, উজানীপাড়া প্রভৃতি এলাকায় পাহাড়ি-বাঙালিরা একসঙ্গে বসবাস করে। দু'চারটে পাহাড়ি পরিবার, দু'চারটে বাঙালি পরিবার এভাবে সারি সারি ঘরবাড়ি। সে এলাকায় গিয়ে দেখলাম আশ্চর্য সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশ। বাঙালি বধূদের পরনে শাড়ি, পাহাড়িদের নিজস্ব পোশাক। মারমা শিক্ষিত তরুণীরা সালোয়ার-কামিজও পরে, নিজস্ব পোশাকও পরে, বাধা নেই। উৎসবে আর পোশাকের ভেদরেখা থাকে না।

মধ্যপাড়ায় দেখলাম রোদে দাঁড়িয়ে বাঙালি-পাহাড়ি নারী-পুরুষেরা গল্প করছে। কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে এক সঙ্গে, হয়ত একই গন্তব্যে। মারমাদের দোকানে বাঙালিরা যেমন তেমনি বাঙালিদের প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয়রা চাকরি করছে, নির্বিবাদে। এই রকম প্রাকৃতিক সৌহার্দ্যপূর্ণ জনপদে অবিশ্বাস আর অশান্তির বীজ রোপণ করে দিয়েছেন শেখ হাসিনা– মমতাহীন এক শাসক। তবে এসব এলাকারও প্রায় প্রতি ঘরে হাসিনার চুক্তির বিরুদ্ধে পার্বত্য বাশিন্দারা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিবাদের কালো পতাকা।

ফেরার পথে এগিয়ে এসে কথা বললেন টেম্পু চালক শ্যামল। বললেন, দাদা, আমি জাতিতে হিন্দু। ১২ বছর আছি। জমিজমা নাই। আমি উপজাতি নই। আমি দাদা বান্দরবান ছেড়ে কোথায়ও যাব না।

মধ্যপাড়া-উজানপাড়া প্রভৃতি বসতি ঘুরে যখন ফিরে এলাম তখন প্রায় তিনটা বেজে গেছে। বান্দরবানের প্রেসক্লাব চত্বর তখন লোকে লোকারণ্য। চারদিকের রাস্তাঘাটে লোক। ছাদে, গাছে, বারান্দায় লোক। তাদের সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি কালো চুক্তি বিভেদের চুক্তি, অশান্তির চুক্তি কোনো মতেই বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না। পাহাড়ি-বাঙালি আমরা মিলে মিশে ছিলাম, মিলে মিশে থাকব। আমার স্বদেশে আমি থাকব। রক্ষা করব দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি।

www.pathagar.com

মঞ্চে আমরা এই দেশবিরোধী, মানবতাবিরোধী, সংবিধান বিরোধী চুক্তির বিরুদ্ধে যখন কথা বলছিলাম, যখন নেতৃবৃন্দ যুক্তি ও তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন এই চুক্তির বিনাশী দিক, তখন গোটা বান্দরবান কাঁপিয়ে সাধারণ মানুষ তাকে সমর্থন করেছে। আর পুলিশের ভিডিও ক্যামেরা ধারণ করেছে সব। গোয়েন্দা দল নোট নিতে নিতে গলদঘর্ম হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে যে বাঙালির বাড়িই বান্দরবান, বিশ্বাস করি, অজানা শঙ্কায় তারও হাত কেঁপে উঠেছে।

এই জনসভা আর গণসংযোগে বান্দরবানের মানুষ বল পেয়েছে, ভরসা পেয়েছে। আমরা বলেছি, গোটা বাংলাদেশের মানচিত্র ধরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, এখন এই মানচিত্রের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে আবার যুদ্ধ হবে। সে যুদ্ধে শরিক হবে বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষ। সে লড়াইয়ে পার্বত্য এলাকার বাসিন্দারা একা নয়, বারো কোটি মানুষ আছে সঙ্গে। সুতরাং দেশপ্রেমিক জনগণের বিজয় কোনো অপশক্তিই রোধ করতে পারবে না।

সূর্য তখন হেলে পড়েছে পশ্চিমে। মানুষের মুখে হাসির ছটা। বান্দরবান থেকে ফেরার পথে রাস্তার দু'পাশে শ' শ' মানুষ অপেক্ষায় ছিলেন। হাত মেলালেন, যেন শপথ নিলেন ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের। এই সব মানুষের স্বপ্ন ও প্রত্যয় কি শেখ হাসিনা তার বিষাক্ত কলমের এক খোঁচায় মুছে দিতে পারবেন?

www.pathagar.com

অনগ্রসর বাঙালির জরাজীবন : আনসার পোস্টে সাদা পতাকা

জানুয়ারি ১৮। কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) প্রতিনিধি দলের সদস্যরা রওয়ানা হলাম খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে।

আমাদের স্মৃতিতে তখনও বান্দরবান। প্রতিনিধি দলের কেউ কেউ এর আগে কোনোদিন পার্বত্য কোনো জেলাই সফর করেননি। তাদের সকলের ঔৎসুক্য পার্বত্য অঞ্চলের নিসর্গ শোভা, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবনাচরণ, জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে। কেউ কেউ আফসোস করছিলেন, এত দিনে কেন একবারও আসেননি পার্বত্য চট্টগ্রাম। রাঙ্গামাটিতে আলাপকালে সেখানকার এক কলেজ শিক্ষক বলেছিলেন, পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মিলিটারী প্রত্যাহার করে নিলে সেখানে হানাহানি আর রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হবে। বাঙালিরা টিকে থাকার জন্য প্রাণপণ লড়াই করবে। সেখান থেকে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতে পারে। সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি কেন হবে জানতে চাইলে তিনি বললেন, বান্দরবানে যদি খবর আসে যে এখান থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে কোনো সন্ত্রাসী হত্যা করেছে কোনো বাঙালি পরিবারকে, তা হলে এ এলাকায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। প্রতিশোধ স্পৃহার জন্ম নেবে। তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর চার-সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। সমতল ভূমি পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমরা খাগড়াছড়ির পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করেছি। আমরা ছোট বড় টিলার গা ঘেঁষে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসনকালে এসব রাস্তা তৈরি হয়েছিল। তার আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্গম। তখন চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি যেতে এক-দেড় দিন লাগত।

চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি যাবার এই একটিমাত্র পথ। খুব বেশি ট্রাফিক নেই। হঠাৎ কখনও ছুটে আসে একটি বাস। বাঙালি-পাহাড়ি যাত্রীরা তাতে বাদুড় ঝোলা হয়ে ছোটেন গন্তব্যে। বাসের ভেতরে, পাদানিতে এবং ছাদে মানুষ। কখনও ছুটে যায় পার্বত্যাঞ্চলের চাঁদের গাড়ি। জিপকে বাসে রূপান্তরিত করে এই গাড়ি তৈরি করা হয়েছে। সে গাড়িতেও প্রচণ্ড ভিড়।

এই সড়কে পাকা রাস্তার দু'পাশে প্রধানত বাঙালিদের বসতি। বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই। কোথায়ও টিনের ঘর, কোথায়ও পাতা কিংবা ছনের ঘর। হতদরিদ্র বাঙালি পরিবার যেমন হয় তেমনি। পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, চেহারায় ক্ষুধার ছাপ। শিশুদের পরনেও নামমাত্র পোশাক। পায়ে জুতা নেই। দেহে অপুষ্টির ছাপ। কোনো কোনো বাচ্চার পেট ভর্তি যে কৃমি আছে, দেখলেই বোঝা যায়। রাস্তা থেকে কিছুটা

www.pathagar.com

দূরে পাহাড়ের উঁচুতে পাহাড়িদের ঘর। সেখানে নারী-পুরুষরা বসে বাঁশের হুঁকায় তামাক খায়। তাদের কারও কারও ঘর কাঠের তৈরি, আকৃতিতে গোল। পথে যেসব পাহাড়ি চলছে, তাদের অধিকাংশের পিঠে জ্বালানি কাঠের বোঝা। দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটে। তাদের পোশাক ভিন্ন। যুবতী-তরুণী মেয়েরা নিসর্গের সঙ্গে যেন মিশে গেছে। তবু তাদের পৃথক মানুষ মনে হয় না। যেমন আমারই বোন, যেন আমারই কন্যা।

জালুয়াপাড়া পৌঁছার আগে মাইলপোস্ট। খাগড়াছড়ি ৫২ কিলোমিটার। আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের পথ। সড়কের নিচে গিরিখাদে একটি মনোহারি দোকান। তার পাশে একটি বন্ধ বেড়াছাড়া ঘরের ওপর সাইনবোর্ড 'শেখ রাসেল স্মৃতি সংসদ'। খানিকটা দূরে প্রাইমারী স্কুল চোখে পড়ল। রমজান উপলক্ষে বন্ধ। যতই এগিয়ে যাচ্ছি পথ ততই আঁকাবাঁকা, উঁচু নিচু। কখনও খাড়া উঠে যাচ্ছি ৫০০ ফুট, আবার নামতেও হচ্ছে একইভাবে। বিপজ্জনক টার্নিং আছে অনেক জায়গায়। বাঙালিদের বাড়ির উঠোনে জাংলায় ফনফনে লাউ গাছ। সাদা ফুল। শুকাতে দেয়া জীর্ণ কাঁথা। ছেঁড়া কাপড়। পাহাড়ের শীর্ষে বিডিআর বা আনসারদের গোল চৌকি। চৌকির শীর্ষে সাদা পাতাকা। শান্তি প্রতীক। শান্তি আমরা চাই। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? সে প্রশ্ন এখন অনুরণিত হচ্ছে গোটা পার্বত্য এলাকায়।

www.pathagar.com

শত মাইল পথে ঘরে ঘরে কালো পতাকা : ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর

খাগড়াছড়ির আনসার কিংবা বিডিআর পোস্টের শীর্ষে সাদা পতাকা শোভা পেলেও জেলার সীমানার শুরু থেকে প্রায় সদর পর্যন্ত যেখানেই ঘর সেখানেই প্রতিবাদের কালো পতাকা টানানো—দোকান, বাড়ি ঘর, বিদ্যুৎ পোল কিংবা গাছের শাখায় বাঁধা সারি সারি কালো পতাকা টানিয়ে শান্তিকামী মানুষেরা বর্ণবৈষম্যবাদী কালো চুক্তির প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তার পাশে নিরাপত্তা বাহিনীর সাদা পতাকা কুয়াশা আর ধূলার মিশ্রণে ধূসর হয়ে গেছে, ম্লান।

বান্দরবানের চেয়েও খাগড়াছড়ির পাহাড়ের উচ্চতা বেশি। তার মধ্যেও ঘুরে ঘুরে পাকা সড়ক। সড়কে চলতে চলতে ডাইনে-বাঁয়ে চোখে পড়ে গভীর গিরিখাদ। পাঁচ শ' হাজার ফুট নিচে দু'এক ঘর পাহাড়ী বাঙালির বসতি। শহরের বাইরে কোথায়ও রিকশা নেই। রিকশা চালানো অসম্ভব ব্যাপার। জীবিকার জন্য এখানকার বাশিন্দাদের প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। তবু টিকে আছে, আর কোথায়ও যাবার নেই বলে।

খাগড়াছড়িতে ১৫/২০ কিলোমিটার ধূ ধূ পাহাড় বিরান পড়ে আছে। হঠাৎ কোথায়ও চোখে পড়ে শাল-গজারির চাষ। কোথায়ও বা কলা। যেটুকু পরিকল্পিত চাষ, তার সবটুকুই করে বন বিভাগ। এই পথে যেতে যেতে মনে হল, সম্ভাবনার হাজার ভাগের এক ভাগও ব্যবহার করা হয়নি। শাল-সেগুনের গাছগুলোও নতুন। কেবল মুলী বাঁশের মত কাণ্ড হয়েছে। কচি ভারী লাল পাতারা দোল খায়। বাকি সব বিরান। ঝোপ-ঝাড়। এ থেকে সামান্য জ্বালানি পাওয়া সম্ভব, আর কিছু নয়।

অথচ এই বিশাল পার্বত্যাঞ্চলে আবাদ হতে পারে চার, আবাদ হতে পারে শাল-সেগুনের। আবাদ হতে পারে রাবারের। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বাংলাদেশের হাজার হাজার শ্রমিক মালয়েশিয়ার এমনি জঙ্গল সাফ করে সেখানে রাবার চাষ করছে, রাবার গাছের বাগান তৈরি করছে। মালয়েশিয়া পৃথিবীর মোট রাবার চাহিদার ৬০ শতাংশ একাই পূরণ করে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে রাবার চাষ করে আমরাও অফুরন্ত চাহিদার বিশাল রাবার বাণিজ্যে প্রবেশ করতে পারতাম। সে ধরনের ব্যাপক উদ্যোগ কখনও গ্রহণ করা হয়নি। তেমনিভাবে এই এলাকায় কেন এত দীর্ঘকালেও পরিকল্পিতভাবে শাল-সেগুনের চাষ করা হয়নি, তাও অস্পষ্ট।

খাগড়াছড়ি যাবার দীর্ঘ পথে একথাই বার বার মনে হয়েছে যে, পরিকল্পিত উপায়ে দেশের বিশাল পার্বত্যাঞ্চল ব্যবহার করতে পারলে বহু আগেও আমাদের দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দশ গুণ হতে পারত।

www.pathagar.com

তবে পার্বত্যাঞ্চলের এসব ক্ষীণবসতির পাহাড়ের বাশিন্দাদের নগর জীবনের এবং বেঁচে থাকার তুলনামূলকভাবে আধুনিক উপকরণের সঙ্গে পরিচিত করেছে বাঙালিরাই। তা না হলে পার্বত্যবাসীদের জীবনধারায় পরিবর্তন আসতো না। পাহাড়ী চাকমাসহ অধিকাংশ উপজাতীয়রা বাংলাদেশে বহিরাগত অভিবাসী। দু'শ'-আড়াই শ' বছর আগে মাত্র তারা এদেশে এসেছে বর্মা ও অন্যান্য এলাকা থেকে। বাংলাদেশের বাঙালিরা এখানে বসবাস করছে হাজার হাজার বছর ধরে। উপজাতীয়রা যখন এখানে এসেছে, বাঙালিরা তখন তাদের স্বাগতই জানিয়েছে। বেঁচে থাকবার, জীবিকার সংস্থানে সাহায্য করেছে। পরস্পর মিলেমিশে অধিকতর বাসযোগ্য করে তুলেছে পার্বত্য ভূমি। আর স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের এক অবিজ্ঞজনোচিত উক্তির ফলে ভারতের মদদে চাকমা উপজাতির সন্ত্রাসী সদস্যরা পার্বত্য এলাকায় সশস্ত্র হাঙ্গামা শুরু করে। তারপর বাংলাদেশে মনিপুরের এমসি প্রিয়ব্রাত্তা এবং সিকিমের লেন্দুপ দর্জির মত বাংলাদেশে এক সরকারের আবির্ভাবে বাংলাদেশের এই অপার সম্ভাবনার পার্বত্য চট্টগ্রাম চলে যাচ্ছে ভারতের হাতে। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী তথা গোটা দেশবাসী সম্মিলিতভাবে সরকারের এই রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত প্রতিরোধে সংকল্পবদ্ধ। সেই সংকল্পে শরিক হতেই আমাদের এই অভিযান।

ততক্ষণে আমরা এখলাস পল্লীও পেরিয়ে গেছি। নিচে তাকিয়ে দেখি গিরিখাদে স্বল্প জায়গায় গহীন এক গিরিখাদে ঝিলের মত হ্রদ। সেখান থেকে পানি তুলে নিচ্ছেন বাঙালি পাহাড়ী গৃহবধূ এবং ভাড়ে করে পানি নিচ্ছে সম্ভবত দোকান কর্মচারীরা। গোসল থেকে শুরু করে খাবার পানি পর্যন্ত সম্ভবত এলাকার সকল পানিরই উৎস এই হ্রদ।

আমরা দ্রুত পেরিয়ে গেলাম গুইমারা। এরপর মাটিরাঙ্গা থানা শুরু। এই পথের পাশে অনেক জায়গায় দেখলাম শুধুমাত্র একটি পরিবারের বাস, বাঙালি। পাহাড়ীরা তুলনামূলকভাবে একসঙ্গে বেশি পরিবার থাকে। এই বাঙালি পরিবারগুলোর সাহস এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার প্রশংসা করতে হয়। কারণ বিরান এক অঞ্চলে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বেঁচে থাকার লাড়াইয়ে তারা এখনও জয়ী এবং আশ্চর্য এই একটি পরিবারও বাড়ির ঘরের কোণায় কিংবা বাঁশের খুঁটির ওপর পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে টানিয়ে রেখে এক-একটি কালো পাতাকা। সরকার ও তার দোসরদের জানিয়ে দিচ্ছে, তারা এই বৈষম্যমূলক কালো চুক্তি মানে না, মানবে না।

মাটিরাঙ্গা থানা এলাকায় কয়েকটি পরিবার নিয়ে দেখলাম ঝোপের ভেতরে একটি পল্লী। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এক এক দল শিশু। তাদের হাসির কল-কাকলিতে ধীর গতির গাড়ি থেকে আমরা চমকে ফিরে তাকালাম। যেন খাগড়াছড়ির অরণ্য পাহাড়ের একেবারে স্বাভাবিক সন্তান। এই শিশুরা এখনও জানে না শেখ হাসিনার সরকার তাদের জন্য কী ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ রচনা করতে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

পুলিশী বালির বাঁধ দিয়ে কি জনতার জোয়ার রোধ করা যাবে?

১৮ জানুয়ারি আমরা খাগড়াছড়ি পৌঁছলাম দুপুর পৌনে ১২টায়। উষ্ণ দিন। ঝরঝর রোদের মধ্যে উপত্যকার শহরে নেমে মনে হলো বিপন্ন আপনজনদের মাঝে এসে হাজির হয়েছি।

এখানে আসার পথে পাহাড়ের ওপরে আছে আলাটিলা, তার পাশে চেদ্দি নদী। জেলা প্রশাসক সেখানে দু'দণ্ড দাঁড়াবার জন্য ক্লান্ত পথিকদের অহ্বান জানিয়েছেন। পিকনিক স্পট। খাগড়াছড়ি শহর সেখান থেকে অনেক নিচুতে। গোটা পাহাড়ি পরিবেশ নদী এবং নগরের এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় আলাটিলা থেকে। মনে হয়, সত্যি দাঁড়াই দু' দণ্ড। ইচ্ছে হল এইখানে একদিন যদি সপরিবারে এসে সারা দিন থাকতে পারতাম।

আলাটিলার শীর্ষে একটি বিশাল বটবৃক্ষ। তার চার দিকে বাঁধাই করা পাশে খোলা ছাউনি। সে ছাউনীতে পাহাড়ি বাঙালি শিশুরা খেলা করছে, নির্ভয়। আমরা তাদের সঙ্গে নানা গল্প করলাম। পাশেই একটি গ্রাম। সে গ্রামেও বাঙালি পাহাড়ী বাংলাদেশীরা মিলেমিশে বসবাস করে। শেখ হাসিনার সরকার এই সৌহার্দ্যের বিরুদ্ধে কেন এত ক্ষাপ্পা হয়ে উঠল বোঝা দায়।

মাটিরাঙ্গা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন বেলায়েত হোসেন ভুঁইয়া। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রাম পরিষদ ও বিএনপি নেতা। তার বাড়ির চালক এই পথে যাতায়াত করে বলে রাস্তা মুখস্ত। তারা যাচ্ছিলেন খুব দ্রুত। মাঝে মধ্যে কোনো মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য।

খাগড়াছড়ি শহরের একেবারে পূর্ব দিকে গিয়ে থামল আমাদের গাড়ি। নেমেই শুনলাম জাসাস প্রতিনিধি দলের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর ও জনসভায় ভাষণদানের মাইকিং করার অপরাধে স্থানীয় ছাত্রদলের দু'জন নেতা গ্রেফতার হয়েছেন আগের দিন। শহরে নাকি অঘোষিত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। মিটিং মিছিল মাইকিং করার চেষ্টা করলেই আটক করা হচ্ছে। কিন্তু সরকারের দেশ বিক্রির পক্ষে কেউ দু'কথা বললে তাকে প্রশাসন একেবারে মাথায় করে নিয়ে নাচছে।

রেজাবুদ্দৌলাহ চৌধুরী, রাজীব, উৎপল সবাই একযোগে সিদ্ধান্ত নিলেন মানবাধিকার বিরোধী, সংবিধান বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী, বর্ণবৈষম্যবাদী পার্বত্য চুক্তির প্রতিবাদে আমরা খাগড়াছড়িতে মিছিল করব। মানি না ১৪৪ ধারা। গ্রেফতার হলে হব।

শহরের পূর্ব প্রান্ত থেকে আমরা সে মিছিল শুরু করলাম। মাত্র শ' খানেক লোক শুরু করেছিলাম মিছিল। মিছিল সামনে এগুতেই ছাত্র-জনতা, পথচারী,

www.pathagar.com

খাগড়াছড়ির সাধারণ মানুষ, দোকানদার, অফিস কর্মচারী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের লোক সে মিছিলে যোগ দিতে শুরু করলেন। মিনিট পনেরোর মধ্যে সে মিছিলে কয়েক হাজার লোক যোগ দিল। তার গগনবিদারী স্লোগানে মানুষ সাড়া দিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মা ও ভগিনীরা উঠানে কিংবা জানালায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানালো। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, পার্বত্য কালো চুক্তির বিরুদ্ধে এই জঙ্গী মনোভাব, মানুষের এই যুথবদ্ধতা দেখে অবিভূত হয়ে পড়লাম।

ঊনসত্তরের অভ্যুত্থানে আমি শরিক হয়েছি, মুক্তিযুদ্ধে আমি শরিক হয়েছি, ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানে আমি শরিক হয়েছি। এই সকল আন্দোলনে মানুষের যে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ শুনেছি, বজ্রমুষ্টি ওপরে তুলে এদেশের সাধারণ মানুষকে জাগতে দেখেছি। খাগড়াছড়িতে ১৮ জানুয়ারিতে মিছিলে শরিক হয়ে পুনরায় সেইসব দিনে ফিরে গেলাম। মনে হল, ঊনসত্তরের আন্দোলনে আছি, মনে হল '৭১-এর মার্চে আছি। মনে হল '৭৫-এর ৭ নভেম্বরে আছি। প্রাণের ভেতরে সেই স্পন্দন অনুভব করলাম। শরীরের ভেতরে সেই তেজ অনুভব করলাম, কণ্ঠে পেলাম তেমন শক্তি। স্লোগানে শরিক হলাম, 'কালো চুক্তি মানি না, মানবো না।'

এক ট্রাক পুলিশ এসে দাঁড়াতে চেয়েছিল মিছিলের সামনে। লাফিয়ে নামল কয়েক ডজন পুলিশ। যেন কোনো অ্যামবুশে যাচ্ছে। দুপুরের রোদের মধ্যে তাদের রাইফেল ঝলসে ওঠে। জীর্ণ বাঁট। বন্দুকের আগায় বেয়োনেট নেই। মনে হল তারা সেই জোয়ারের মত উত্থিত জনস্রোতের দিকে তাক করবে রাইফেল। তারপর নির্বিচার গুলি চালাবে। অগ্রসরমাণ পুলিশদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল আমার অনুজ, ভাই। ওরা কেন ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র বাগিয়ে ধরে?ও রা কেন গুলি করে দেয় নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষদের ওপর? সরকার নির্দেশ দেয় বলে?

তবু কেন জানি না, শেষ পর্যন্ত মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করেনি, গুলি চালায়নি, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেনি। বরং পথের এক পাশে দাঁড়িয়ে সম্ভবত তারাও এই জনস্রোত এই প্রতিবাদ অবলোকন করেছে।

আমরা যখন খাগড়াছড়ির শাপলা চত্বরে ফিরে এলাম তখন মিছিলে কমপক্ষে পাঁচ ছয় হাজার লোক। যেদিকে তাকাই লোক। লোকে লোকারণ্য। শাপলা চত্বর পেরিয়ে আমরা গেলাম টাউন হলে। শাপলা চত্বরে মিটিং করতে দেবে না পুলিশ। বললাম টাউন হলেই হবে।

মানুষ আসতে শুরু করল দল বেঁধে। ছুটে। যে যেখানে ছিল সেখান থেকে। এই ফাঁকে বেরোলাম শহরে। উঠলাম এক তরুণ চালকের রিকশায়।

-ভাই বাড়ি কোথায়?

ছিল কুড়িগ্রাম, এখন খাগড়াছড়ি।

-কবে এসেছেন?

তিন বছর।

–এখন তো ফিরে যেতে হবে।

সে বলল, কোথায়?

-কেন কুড়িগ্রামে।

সেখানে তো আমার কেউ নেই।

www.pathagar.com

–তাহলে অন্য কোথায়ও যাবেন।

কোথায়?

-চট্টগ্রাম কিংবা ঢাকায়?

সেখানেওতো আমার কেউ নেই।

-কিন্তু যেতে তো আপনাকে হবেই।

কিন্তু যে বলেন! আমি ঢাকা বা চট্টগ্রামে থাকতে পারব। তা হলে খাগড়াছড়ি থাকতে পারব না কেন? ঢাকা-চট্টগ্রাম-কুড়িগ্রামও আমার দেশ। খাগড়াছড়িও আমার দেশ। আমার যেখানে খুশি থাকব। এই জায়গাটা আমার ভাল লাগছে।

-ভাল লাগছে বলে আর যেখানেই থাকুন না কেন, শেখ হাসিনার সরকার আপনাকে খাগড়াছড়ি থাকতে দেবে না। এটা জানেন?

সে বলল, আরে রাখেন। কত হাসিনা এল গেল। আমরা বাংলাদেশীরা জায়গা মতই আছি।

আমি রিকশায় হেলান দিয়ে বসলাম। দূরে পাহাড়ের ছায়া। শহর প্রায় জনশূন্য। সকলেই ছুটছে টাউন হলের দিকে। টাউন হল উপচে মানুষ ঠাঁই করে নিল গোটা চত্বরে। চত্বর থেকে প্রধান সড়কে।

এই বিস্ময়কর জনউত্থানের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকি। জনতার এই জোয়ার কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুলিশী গুলির বালির বাঁধ দিয়ে রোধ করতে পারবেন?

www.pathagar.com

আমার স্বদেশের চেয়ে বড় কিছু নাই প্রিয় কেহ নাই

খাগড়াছড়ি টাউন হলে জাসাসের নেতৃবৃন্দের সভার আয়োজন। সে আয়োজন ভণ্ডুল করার চেষ্টা করেছে সরকার। কিন্তু সরকারের উদ্যোগই ভণ্ডুল করে দিল খাগড়াছড়ির লড়াকু মানুষেরা। কালো পতাকার শহর খাগড়াছড়ি। ঘরে-বাড়িতে-বেসরকারি দফতরের শীর্ষে উড়ছে কালো-পতাকা। দেশবিরোধী চুক্তির যারাই বিরোধিতা করেছে, সরকার তাদের ওপরই খড়গহস্ত হয়েছে। লাভ হয়নি। পুলিশের গাড়ি ধেয়ে যায়। বিডিআর-এর গাড়ি ধেয়ে যায়। মিলিটারির গাড়ি চলে যায়। জনতা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। প্রশ্ন অস্তিত্বের। প্রশ্ন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দেশের অখণ্ডতা রক্ষার, প্রশ্ন জীবন-জীবিকার এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের।

জাসাসের গণসংযোগ সভায় বক্তৃতা করলেন দলমত নির্বিশেষে গঠিত এলাকার ঐক্য পরিষদ নেতারা। বক্তৃতা করলেন বিএনপি'র বেলায়েত হোসেন ভুঁইয়া, জামায়াতের আবদুল মোমেন, বক্তৃতা করলেন চেয়ারম্যান আবুল কাশেম এবং মোহাম্মদ ইলিয়াস, দিলশাদ আলম, মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, আবদুল্লাহ-আল মামুন। সভাপতিত্ব করলেন নাসির আহমেদ নাসির। প্রতি বক্তার কণ্ঠেই দৃঢ় অঙ্গীকার। সে অঙ্গীকার শুধু বাতকে বাত নয়। সে অঙ্গীকারের ধ্বনি প্রত্যয়, সে অঙ্গীকারে দেশ রক্ষার ডাক।

এই সভার শেষ পর্যায়ে এসে ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ ছত্রখান হয়ে গেল না। যে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে থাকল প্রায় তেমনই। বৃষ্টি কোনো বাধাই হল না তাদের কাছে। তারা বললেন, চুক্তিবিরোধী কেন্দ্রীয় নেতারা যে কর্মসূচি দেবেন দেশ রক্ষার জন্য, সে কর্মসূচি জীবন দিয়ে পালন করবেন তারা। এই ঘোষণায় কোনো খাদ ছিল না।

সভাশেষে আমরা যখন বেরোলাম, তখনও বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছিল। বেপরোয়া মানুষ, পুলিশ, আনসারের সঙ্গে করমর্দন করলাম। তাদের হাতে জীবনের উষ্ণতা। একি কেউ ঘোষণা দিয়ে কেড়ে নিতে পারে?

গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বের করে রাখলেন জাসাস সাধারণ সম্পাদক রাজীব। তার হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিল সহস্র মানুষ, যেন জানান দিল, এই হৃদয়-ছোঁয়া সম্পর্ক অটুট থাকবে। আমরা রক্ষা কর দেশের অখণ্ডতা।

খাগড়াছড়ি শহর ছেড়ে আমাদের গাড়ি যখন পুনরায় পাহাড়ি পথ ধরল, তখন বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। স্বজন-বিচ্ছেদের বেদনায় হাহাকার করে উঠল

www.pathagar.com

হৃদয়। মনে হল, খাগড়াছড়ির ভাই-বোনদের সুখে-দুঃখে তাদের সঙ্গে আরও ক'টা দিন যদি থেকে যেতে পারতাম!

তখনও হালকা বৃষ্টি ঝরছে। গাড়ি এসে থামল এক পাহাড়ের কোণায়। আমাদের পেছনের গাড়ি বেশ পেছনে পড়ে গিয়েছিল। সেখানে দেখলাম লজ্জাবতীর পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুতার মত সরু লাল লাল পাপড়িতে বাহারী ফুল ফুটেছে। শত শত। লজ্জাবতীর পাতা মানুষের স্পর্শে মুখ ঢাকে, কিন্তু ফুলেরা যেন হেসে উঠল। তখনও আকাশে বৃষ্টির ফাঁকে ম্লান আলো। তার ভেতরই লজ্জাবতীর ফুলের হাসি। যেন খাগড়াছড়ির জানালার পাশে দাঁড়ানো তিন বছরের শিশু। প্রতিবাদী মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

প্রায় চেনা পথ। মাটি, বৃক্ষ, ফুল, ফল এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ, পাহাড় চূড়া ও গভীর গিরিখাদের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এলাম মাটিরাঙ্গায়।

মাটিরাঙ্গায় রাস্তার ওপর হাজার হাজার মানুষের ভিড়। ভাবলাম, বুঝি আবারও শেখ হাসিনা সরকারের নির্দেশে মাটিরাঙ্গার সাধারণ মানুষ আমার কোনো ভাই বা বোনকে খুন করা হয়েছে। তারই প্রতিবাদের আয়োজন। মাত্র কয়েকদিন আগে শেখ হাসিনার তাঁবেদার সরকার এই মাটিরাঙ্গার প্রতিবাদী দেশপ্রেমিক মানুষের ওপর নির্বিচার গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে ১১ জনকে। আজ কি আবারও ড্রাকুলার মত রক্তপিপাসায় হিংস্র হয়ে উঠেছে সরকার?

আমরা সবাই নামলাম। এগিয়ে গেলাম জনতার মাঝখানে।

না, ১৮ জানুয়ারি মাটিরাঙ্গায় গুলি হয়নি। সেদিন নতুন করে কেউ শাহাদাত বরণ করেননি। মাটিরাঙ্গার দেশপ্রেমিক ভাই-বোনেরা জেনে গেছেন, এই পথে আজই ফিরব আমরা। মঞ্চ সাজিয়ে, মাইক লাগিয়ে হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছিলেন, আমরা যেন তাদের উদ্দেশে কিছু বলি। আমরা মঞ্চে উঠে গেলাম। এই পথে চলাচলকারী যানবাহনগুলোও জানে মাটিরাঙ্গার বীর-জনতা দেশবিরোধী পার্বত্য কালো চুক্তির বিরুদ্ধে জান দিতে কসুর করে না। তারাও সেভাবেই পার হয়ে গেল।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখলাম, যতদূর চোখ যায় মানুষ আর মানুষ। রাস্তায়, বাড়ির ছাদ, বৃক্ষের শাখায়, জানালায় হাজার হাজার মানুষ উন্মুখ হয়ে আছেন। সকল নারী-পুরুষকে মনে হল ভগিনী ও ভাই, সকল শিশুকে মনে হল প্রিয়জন। আমরা বললাম। তারা সাড়া দিলেন। আমরা তো তিমির বিনাশী হতে চাই; শেখ হাসিনার সরকার কি তিমির বিলাসী?

মাটিরাঙ্গা তথা পার্বত্য জেলাবাসীর লড়াইয়ের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে গিয়ে বুক ভারি হয়ে এল। এই নিরীহ শান্তিপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করেছে শেখ হাসিনার সরকার? কী তাদের অপরাধ? অপরাধ তারা দেশপ্রেমিক। শেখ হাসিনার সরকার কি তবে কোনো দখলদার সরকার? তবে কি তারা কোনো ভাড়াটে বাহিনী?

www.pathagar.com

পেছনে স্বজনদের ফেলে আবারও যাত্রা শুরু করলাম। টিপটিপ বৃষ্টি, যেন আমার পার্বত্য বাশিন্দা ভাই-বোনদের হৃদয়ের অশ্রু। আঁকাবাঁকা সরু পথ কখনও উঠে গেছে খাড়া ওপরে, কখনও নেমেছে সোজা নিচে।

এভাবেই আমরা এসে পৌছলাম রামগড়। সেখানেও একই দৃশ্য। থানা সদর লোকে লোকারণ্য। তখন পৌনে পাঁচটা। থামলাম। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ। একটি টেবিল দিয়ে মঞ্চ। চারদিকে মাইক লাগানো। কিছু বলতে হবে।

ইফতারের সময় হয়ে আসছিল। আমরা আমাদের কথা বললাম। খালেদা জিয়ার কথা বললাম। বললাম দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রামে খালেদা জিয়া আছেন পাশে। তিনিও আসবেন আপনাদের কাছে। দেশ বিক্রি করার চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে লড়ব এক সঙ্গে। এ কথায় মানুষের সে কি আনন্দ! সে কি ভরসা! অভিনন্দন, লাল সালাম।

ইফতারের কিছু আগে আমরা আবার রওয়ানা হলাম। দেখলাম ১৫/২০টি ট্রাক ভর্তি সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে একটি মার্কিন তেল কোম্পানি দল খাগড়াছড়ির দিকে যাচ্ছে। এর আগে শান্তি বাহিনী মার্কিন তেল কোম্পানির তিন জনকে অপহরণ করেছিল। এবার সে ভয় নেই।

রামগড়ের চা বাগান দেখে আবারও মনে হল, এত বড় সম্ভাবনার এই এলাকায় কেন সুপরিকল্পিতভাবে আরও চা বাগান তৈরি করা হয়নি। কেন বিপুল সম্ভাবনাময় এই এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করে তোলা হয়নি।

গাড়ি ছুটছিল। খুরশীদউজ্জামান উৎপল একটি খালের মত নদী দেখিয়ে বললেন, এটা ফেনী নদী। দেখেন, ওপারেই ভারত। দশ গজও দূর হবে না। ফেনী নদীর ওপারে ভিন্ন দেশ। থাকুক তারা শান্তিতে। আমি আমার স্বদেশে শান্তিতে থাকতে চাই।

গাড়ি ছুটছিল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বারৈয়ার হাটের দিকে। খুব বেশি দূর নেই আর। কিন্তু কেবলই স্বজন বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করতে থাকলাম বুকের ভেতরে।

আমি চীনের প্রাচীর ছুঁয়ে দেখেছি, মস্কোর ঘণ্টা ছুঁয়ে দেখেছি, মিশরের পিরামিড ছুঁয়ে দেখেছি, আগ্রার তাজমহল ছুঁয়ে দেখেছি, আটলান্টিকের গভীর নীল পানি স্পর্শ করে দেখেছি, থাইল্যান্ডের গভীর অরণ্যে প্রাচীন বৃক্ষ, হল্যান্ডের টিউলিপ ছুঁয়ে দেখেছি, দয়িতার কর স্পর্শ করে দেখেছি, সন্তানের মাথায় হাত রেখে দেখেছি, ঘ্রাণময় কচি শিশুর গালে চুমু খেয়ে দেখেছি, আমার বাংলাদেশের চেয়ে প্রিয় কিছু নাই, আমার স্বদেশের চেয়ে প্রিয় কিছু নাই। স্বদেশের চেয়ে বড় কোন প্রেম নাই, বড় কোন ভালবাসা নাই, আমার স্বদেশের চেয়ে বড় কেহ নাই, কিছু নাই।

www.pathagar.com

ফারাক্কা চুক্তি ১৯৭৭

ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন প্রশ্নে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৫ নবেম্বর, শনিবার। দীর্ঘ ২৫ বছরের আলোচনার পর স্বাক্ষরিত হয়েছে এ চুক্তি। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষ হতে স্বাক্ষর করেন নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান এবং ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভারতের কৃষি ও সেচমন্ত্রী শ্রী সুরজিত সিং বারনালা। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত এ ঐতিহাসিক চুক্তির বিশেষ-বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : শুষ্ক মওসুমের ২১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ১০ দিনের শুষ্কতম সময়ে বাংলাদেশ ৩৪ হাজার ৫শ কিউসেক এবং ভারত ২০ হাজার ৫শ কিউসেক পানি পাবে। এ সময়ে গঙ্গায় মোট পানি প্রবাহের পরিমাণ ৫৫ হাজার কিউসেক। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হবার দিন থেকে ৫ বছর পর বলবৎ থাকবে। পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আরো বৃদ্ধি করা যাবে। কার্যকর হবার দিন থেকে ৩ বছর পর উভয় সরকার পুনরায় চুক্তিটি পর্যালোচনা করবেন। চুক্তি বলবৎ থাকাকালে ফারাক্কা বাঁধ থেকে দেয় বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির পরিমাণ হ্রাস করা যাবে না। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৫ মাস কাল গঙ্গার পানির প্রকৃত বণ্টন স্থায়ী হবে। ১০ দিন ১০ দিন করে দু'দেশের মধ্যে চুক্তিতে উল্লেখিত পানি ভারত ছাড়বে। ফারাক্কা বাঁধের নীচে ও ফিডার খাতে এবং বাংলাদেশে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচে দৈনিক পানির প্রবাহও রেকর্ড করা হবে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন শুষ্ক মওসুমে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি সম্পর্কিত স্কীম তদন্ত পরীক্ষা করবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কায় পানি বণ্টনের হার দেখানো হচ্ছে :

সময়	ফারাক্কায় পানি প্রবাহ (১৯৪৮-৭৩ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা তথ্যের ৭৫ শতাংশ নির্ভরযোগ্যঅর ভিত্তিতে)	ফারাক্কায় ভারতের প্রাপ্য পানির পরিমাণ	বাংলাদেশ প্রাপ্য পানির পরিমাণ
১	২	৩	৪
জানুয়ারি ১-১০	৯৮,৫০০ কিউসেক	৪০,০০০ কিউসেক	৫৮,৫০০ কিউসেক
জানুয়ারি ১১-২০	৮৯,৭৫০ কিউসেক	৩৮,৫০০ কিউসেক	৫১,২৫০ কিউসেক
জানুয়ারি ২১-৩০	৮২,৫০০ কিউসেক	৩৫,০০০ কিউসেক	৪৭,৫০০ কিউসেক
ফেব্রুয়ারি ১-১০	৭৯,২৫০ কিউসেক	৩৩,০০০ কিউসেক	৪৬,২৫০ কিউসেক

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি ১১-২০	৭৪,০০০ কিউসেক	৩১,৫০০ কিউসেক	৪২,৫০০ কিউসেক
ফেব্রুয়ারি ২১-২৯	৭০,০০০ কিউসেক	৩০,৭৫০ কিউসেক	৩৯,২৫০ কিউসেক
মার্চ ১-১০	৬৫,২৫০ কিউসেক	২৬,৭৫০ কিউসেক	৩৮,৫০০ কিউসেক
মার্চ ১১-২০	৬৩,৫০০ কিউসেক	২৫,৫০০ কিউসেক	৩৮,০০০ কিউসেক
মার্চ ২১-৩১	৬১,০০০ কিউসেক	২৫,০০০ কিউসেক	৩৬,০০০ কিউসেক
এপ্রিল ১-১০	৫৯,০০০ কিউসেক	২৪,০০০ কিউসেক	৩৫,০০০ কিউসেক
এপ্রিল ১১-২০	৫৫,৫০০ কিউসেক	২০,৭৫০ কিউসেক	৩৪,৭৫০ কিউসেক
এপ্রিল ২১-৩০	৫৫,০০০ কিউসেক	২০,৫০০ কিউসেক	৩৪,৫০০ কিউসেক
মে ১-১০	৫৬,৫০০ কিউসেক	২১,৫০০ কিউসেক	৩৫,০০০ কিউসেক
মে ১১-২০	৫৯,২৫০ কিউসেক	২৪,০০০ কিউসেক	৩৫,২৫০ কিউসেক
মে ২১-৩১	৬৫,৫০০ কিউসেক	২৬,৭৫০ কিউসেক	৩৮,৭৫০ কিউসেক

ফারাক্কা বিরোধের সূত্রপাত ঘটে মূলত ১৯৫১ সালের অক্টোবর। ভাগীরথী নদীর পানি প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখা এবং কলকাতা বন্দর নাব্য রাখার নামে খরা মওসুমে গঙ্গার পানিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারত সরকার। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর থেকেই এ বিরোধের শুরু। এরপর থেকে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে, মন্ত্রী পর্যায়ে এমনকি শীর্ষ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অসংখ্য বৈঠকের পর পরও এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এ চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত করা যায়নি।

১৯৬১ সালের ৩০ জানুয়ারি ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করে। ১৯৭০ সালে ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কায় এ বাঁধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে ১৯৭২ সালে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর পানি উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়। তবে ফারাক্কা সমস্যাটিকে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনার জন্য রেখে দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালের প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠক অনুসারে শুষ্ক মওসুমে গঙ্গার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাব্য পন্থা বের করার দায়িত্ব যৌথ নদী কমিশনকে দেয়া হয়। এ বছরই ঢাকায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে স্থির হয়, ১৯৭৫ সালের ২১ থেকে ৩১ এপ্রিল পর্যন্ত দশদিন পানির প্রবাহ কম থাকার সময় পরীক্ষামূলকভাবে ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করতে পারবে। এ সময় ভারত পানি প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ১১ হাজার থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পর্যন্ত পানি প্রত্যাহার করতে পারবে। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কার পানি প্রত্যাহার করে এবং ফারাক্কা বাঁধ চালু করে। বাংলাদেশ এর প্রতিবাদ জানায়। পুনরায় আলোচনা শুরু হয়। বৈঠক ব্যর্থতার এক পর্যায়ে বাংলাদেশ সমস্যাটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদেও উত্থাপন করে। এই অধিবেশনে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটির আশু সমাধানের আহ্বান জানানো হয়। এরপরে পুনরায় বেশ ক'টি কর্মকর্তা ও মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর এ বছরের এপ্রিলে উভয় দেশ একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। এ সমঝোতার

www.pathagar.com

ভিত্তিতেই আরো ক'টি বৈঠকের মধ্যে চুক্তির খুঁটিনাটি বিষয় নির্ধারিত হয় এবং সবশেষে ০৫ নবেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছরের বিরোধের মীমাংসা হয়।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা রিয়ার এডমিরাল এম এইচ খান একে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দলিল বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ভারতের কৃষি ও সেচমন্ত্রী শ্রী সুরজিত সিং বারনালা একে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ফল বলে বর্ণনা করেন।

সূত্র: বিচিত্রা, ১১-১৭ নভেম্বর ১৯৭৭

www.pathagar.com

পানি বণ্টন চুক্তি (১৯৯৬) : পূর্ণ বিবরণ

নয়া দিল্লী হইতে কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ বৃহস্পতিবার নয়া দিল্লীতে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গাপানির বণ্টন বিষয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তির পূর্ণ বিবরণ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং গণপ্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার, দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রসার এবং সুদৃঢ় করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হইয়া; নিজেদের দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে অভিন্ন ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া; পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদ-নদীসমূহের পানি বণ্টনের বিষয়ে এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা, সেচ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন এবং পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করিয়া দুই দেশের জনসাধারণ ইহার পারস্পরিক উপযোগ সাধনের বিষয়ে আগ্রহী হইয়া; পরস্পরের চাহিদা পূরণের বিষয়ে সহযোগিতার মনোভাব নিয়া ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং দুই দেশের জনসাধারণের পারস্পরিক স্বার্থে গঙ্গা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া; বর্তমান চুক্তিতে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা ছাড়া দুই দেশের স্ব স্ব অধিকার ও দাবীর ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হইবে না কিংবা আইনের সাধারণ নীতিমালার সূত্র হিসেবে পরিগণিত হইবে না কিংবা ভবিষ্যতে নজীর হিসেবে ব্যবহৃত হইবে না, এমন ব্যবস্থাধীনে গঙ্গা বিষয়ক সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক সমাধানের বিষয়ে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া সম্মত হইতেছে যে :

অনুচ্ছেদ-১ : ভারত বাংলাদেশকে যে পরিমাণ পানি দিতে সম্মত হইবে উহা ফারাক্কায় ছাড়া হইবে।

অনুচ্ছেদ-২ : (১) প্রতি বৎসর ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ মে পর্যন্ত প্রতি ১০ দিন সময়কালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন হইবে পরিশিষ্ট-১-এর ফর্মুলা অনুযায়ী এবং পরিশিষ্ট-১-এর অধীনস্থ ব্যবস্থাধীন সম্ভাব্য শিডিউল পরিশিষ্ট-২-এ প্রদত্ত হইয়াছে। (২) উপরে উল্লিখিত (১) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সম্ভাব্য শিডিউল ৪০ বৎসর (১৯৪৯-১৯৮৮) সময়কালে ফারাক্কায় ১০ দিন সময়কালে গড় পানি প্রাপ্যতার ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। উপরে উল্লিখিত ৪০ বৎসরের গড় পানি প্রাপ্যতা রক্ষায় উজানে সার্বিক প্রয়াস চালান হইবে। (৩) কোন ১০ দিন সময়কালে ফারাক্কায় পানি প্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের কম হইলে

www.pathagar.com

সমতার নীতি, ন্যায্যতা এবং কোন পক্ষের ক্ষতি না করিয়া জরুরী ভিত্তিতে সমন্বয় সাধনের জন্য দুই সরকার অবিলম্বে আলোচনায় মিলিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩ : ফারাক্কা এবং বাংলাদেশের যে স্থানে গঙ্গার উভয় তীর অবস্থিত সেই পয়েন্টে অনুচ্ছেদ-১-এর অধীনে ফারাক্কায় পানি প্রবাহ ভারত কর্তৃক, পানির যৌক্তিক ব্যবহারের জন্য ব্যতিরেকে, যাহার পরিমাণ ২ শত কিউসেকের বেশি হইবে না, হ্রাস করা হইবে না।

অনুচ্ছেদ-৪ : চুক্তি স্বাক্ষরের পর এখন দুই সরকারের মনোনীত সমান সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হইবে (ইহাকে বলা হইবে যৌথ কমিটি)। এই যৌথ কমিটি ফারাক্কা ও হার্ডিঞ্জ সেতুতে পর্যবেক্ষণ দল নিয়োগ করিবে এবং তাঁহারা ফারাক্কা বাঁধের নীচে ও হার্ডিঞ্জ সেতুতে ফিডার ক্যানেলে প্রতিদিনের পানির প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করিবে।

অনুচ্ছেদ-৫ : যৌথ কমিটি নিজেদের কাজের পদ্ধতি ও কার্যক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

অনুচ্ছেদ-৬ : যৌথ কমিটি তাহাদের সংগৃহীত সকল উপাত্ত দুই সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং তাঁহারা উভয় সরকারের নিকট বার্ষিক রিপোর্টও প্রদান করিবে। এই রিপোর্ট পেশের পর দুই সরকার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথাযথ পর্যায়ে বৈঠকের ব্যবস্থা করিবে।

অনুচ্ছেদ-৭ : যৌথ কমিটি চুক্তির ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে এবং ইহা বাস্তবায়নে ও ফারাক্কা বাঁধের প্রবাহে কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহারা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এ ব্যাপারে কোন সমস্যা বা বিতর্ক দেখা দিলে এবং যৌথ কমিটি তাহা নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে বিষয়টি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইবে। ইহার পরও বিষয়টির নিষ্পত্তি না হইলে উহা দুই সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং যথাযোগ্য পর্যায়ে জরুরী বৈঠকের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনায় দুই সরকার তাহা মীমাংসা করিবে।

অনুচ্ছেদ-৮ : দুই সরকার শুষ্ক মওসুমে গঙ্গার প্রবাহের দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা খুঁজিয়া বাহির করার কাজে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়াছে।

অনুচ্ছেদ-৯ : সমতা, ন্যায় ও কোন পক্ষের জন্য ক্ষতিকর নয় এই নীতির ভিত্তিতে দুই সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন প্রশ্নে চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছে।

অনুচ্ছেদ-১০ : চুক্তির আওতায় পানি বণ্টন ব্যবস্থা পাঁচ বছর অন্তর কিংবা পরস্পরের মতামতের ভিত্তিতে দুই সরকার পর্যালোচনা করিবে। ইহার কার্যকারিতা দুই বছর পর পর্যালোচনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১১ : এই চুক্তির মেয়াদকালে সাযুজ্যকরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমঝোতার অনুল্লেখ থাকিলে অনুচ্ছেদ ১০'এ উল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত ফারাক্কা বাঁধের ভাটিতে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে অনুচ্ছেদ ২'এ বিধৃত ফর্মুলা মোতাবেক অন্যূন ৯০ শতাংশ পানি ছাড়িবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-১২ : এই চুক্তি স্বাক্ষরদানের পরপরই কার্যকর হইবে এবং ৩০ বৎসর মেয়াদকালের জন্য ইহা বলবৎ থাকিবে। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এই চুক্তি নবায়নযোগ্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেব গৌড়া ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ নিজ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। নয়াদিল্লীতে ১২ ডিসেম্বর সম্পাদিত এই চুক্তিটি হিন্দি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত। চুক্তির বর্ণনায় কোন সংশয় দেখা দিলে ইংরেজি ভাষার বর্ণনাই অনুসৃত হইবে।

সংযোজনা-১

ফারাক্কায় পানির প্রাপ্যতা	**ভারতের অংশ**	**বাংলাদেশের অংশ**
৭০,০০০ কিউসেক অথবা কম	৫০%	৫০%
৭০,০০০-৭৫,০০০ কিউসেক	প্রবাহের অবশিষ্টাংশ	৩৫,০০০ কিউসেক
৭৫,০০০ কিউসেক বা অধিক	৪০,০০০ কিউসেক	প্রবাহের অবশিষ্টাংশ

শর্ত অনুযায়ী ১ মার্চ হইতে ১০ মে পর্যন্ত ১০ দিনের তিনটি পালাক্রমে ভারত ও বাংলাদেশ প্রত্যেকে সুনিশ্চিতভাবে ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাইবে।

তফসিল

(প্রতি বছর ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ মে'র মধ্যে ফারাক্কায় পানি বণ্টন) পানির প্রকৃত প্রাপ্যতা ১৯৪৯ হইতে ১৯৮৮ পর্যন্ত গড় প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হইলে পক্ষদ্বয়ের অংশ সংযোজনা-১-এ বিধৃত ফর্মুলা অনুযায়ী হইবে।

সংযোজনা-২

সময়	**গড় মোট প্রবাহ ১৯৪৯-৮৮ (কিউসেক)**	**ভারতের অংশ (কিউসেক)**	**বাংলাদেশ অংশ (কিউসেক)**
জানুয়ারি ১-১০	১,০৭,৫১০	৪০,০০০	৬৭,৫১৬
জানুয়ারি ১১-২০	৯৭,৬৭৩	৪০,০০০	৫৭,৬৭৩
জানুয়ারি ২১-৩০	৯০,১৫৪	৪০,০০০	৫০,১৫৪
ফেব্রুয়ারি ১-১০	৮৬,৩২৩	৪০,০০০	৪৬,৩২৩
ফেব্রুয়ারি ১১-২০	৮২,৮৫৯	৪০,০০০	৪২,৮৫৯
ফেব্রুয়ারি ২১-২৮	৭৯,১০৬	৪০,০০০	৩৯,১০৬
মার্চ ১-১০	৭৪,৪১৯	৩৯,৪১৯	৩৫,০০০
মার্চ ১১-২০	৬৮,৯৩১	৩৩,৯৩১	৩৫,০০০
মার্চ ২১-৩১	৬৪,৬৮৮	৩৫,০০০	২৯,৬৮৮
এপ্রিল ১-১০	৬৩,১৮০	২৮,১৮০	৩৫,০০০
এপ্রিল ১১-২০	৬২,৬৩৩	৩৫,০০০	২৭,৬৩৩
এপ্রিল ২১-৩০	৬০,৯৯২	২৫,৯৯২	৩৫,০০০
মে ১-১০	৬৭,৩৫১	৩৫,০০০	৩২,৩৫১
মে ১১-২০	৭৩,৫৯০	৩৮,৫৯০	৩৫,০০০
মে ২১-৩১	৮১,৮৫৪	৪০,০০০	৪১,৮৫৪

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৬

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি : পূর্ণ বিবরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসিদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন ;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতি সমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বণ্যিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক)	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ)	এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ)	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

www.pathagar.com

খ) **পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ**

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারা সমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪-মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে-"কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

www.pathagar.com

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবেঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

www.pathagar.com

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারন অথবা অন্যকোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

www.pathagar.com

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

www.pathagar.com

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ— এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

www.pathagar.com

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

খ) পুলিশ (স্থানীয়);

গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

ঘ) যুব কল্যাণ;

ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতিত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতিত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

ট) মহাজনী কারবার;

ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;

খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশবিশেষ;

জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;

ঞ) ব্যবসার উপর কর;

ট) লটারীর উপর কর;

ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

www.pathagar.com

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যান সহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় ((মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১জন এবং অন্যান্য উপজাতি থেকে হইতে ১জন নির্বাচিত হইবেন।

পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিল করণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহি কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে

www.pathagar.com

একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদ সমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা সহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্ট করণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত

www.pathagar.com

শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার;

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদ সহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

www.pathagar.com

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

www.pathagar.com

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে-সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতিত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময় সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

www.pathagar.com

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
৮) সাংসদ, বান্দরবান
৯) চাকমা রাজা
১০) বোমাং রাজা
১১) মং রাজা
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে	পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)	(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
আহ্বায়ক	সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
বাংলাদেশ সরকার	

www.pathagar.com

চুক্তির বিশেষ দিক

★ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

★ স্বাক্ষরের পর হইতেই চুক্তি বলবৎ হইবে।

★ বিডিআর ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হইবে।

★ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

★ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হইবে। একজন উপজাতীয় এই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হইবেন।

★ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনসমূহ পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোকন করা হইবে।

★ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নূতন নাম হইবে পার্বত্য জেলা পরিষদ।

★ প্রতি জেলা পরিষদের তিনটি মহিলা আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

★ পরিষদের সহিত আলোচনা ছাড়া সরকার কোন জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করিবে না।

★ কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকারভিত্তিতে জমির মূল মালিকদিগকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

★ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু হইবে।

★ তিন জেলা সমন্বয়ে ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে। ইহার মেয়াদ হইবে পাঁচ বছর।

★ পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। তাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি হইবেন উপজাতীয়।

★ পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তা হইবেন একজন যুগ্ম-সচিব সমপর্যায়ের। উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

★ আঞ্চলিক পরিষদ তিন জেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয়সাধন এবং তত্ত্বাবধান করিবে।

★ উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে এবং ইহা ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিবে।

★ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য আইনে অসংগতি থাকিলে তাহা দূর করা হইবে।

★ পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ তিন বছরের পরিবর্তে পাঁচ বছর হইবে।

★ জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন উপ-সচিবের সমতুল্য এবং এ পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

www.pathagar.com

★ জেলা পরিষদ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করিবে। তবে পরিষদের সহিত আলাপ করিয়া সরকার কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে। তাহাদের বদলি, অপসারণ ইত্যাদিও সরকারই করিবে।

★ পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সরকার পরিষদকে পরামর্শ প্রদান ও অনুশাসন এবং প্রয়োজনে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে ও পরামর্শ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

★ পরিষদ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও অধঃস্তন স্তরের সকল সদস্যকে নিয়োগ করিবে এবং উপজাতীয়রা অগ্রাধিকার পাইবে।

★ পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

★ নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইবার পূর্বে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

★ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে সরকার এই পরিষদের সহিত আলাপ করিবে।

★ শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।

★ শরণার্থীদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা হইবে।

★ অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ভূমি কমিশন গঠন করা হইবে।

★ উপজাতীয় শরণার্থীদের ঋণ সুদ মওকুফ করা হইবে।

★ সরকারী চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা বহাল থাকিবে।

★ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা হইবে।

★ জনসংহতি সমিতি ইহার সদস্যদের তালিকা এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণ ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবে।

★ নির্ধারিত তারিখে অস্ত্র জমা দিলে সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা ও মামলা প্রত্যাহার করিবে। তবে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবে।

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক, ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইরাক
ইরান
সৌদি
আরব